## শাহীনুর রহমান

শাহীনুর রহমান ৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন পর্ষদ

শাহীনুর রহমান

শাহীনুর রহমান ৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন পর্ষদ

উদ্‌যাপন পর্ষদ

আহ্বায়ক
মোহাম্মদ বারী

সদস্য
রাজীব নূর
দীপংকর দাশ
ফয়েজ জহির
আজাদ আবুল কালাম
হাসান শাহরিয়ার
আলফ্রেড খোকন
জাফর আহমদ রাশেদ
আহমাদ মোস্তফা কামাল
নজরুল কবীর
রোকন রহমান
মনির মৃত্তিক
তরুণ সরকার
সত্যজিৎ পোদ্দার বিপু
মোবাশ্বির আলম মজুমদার
সাবিরা শাহীনুর পল্লবী
অনন্ত হিরা
প্রশান্ত হালদার
কল্লোল চৌধুরী
শাহ মোহাম্মদ আলম
অলকা নন্দিতা
শ্রাবণী ফেরদৌস
শুভ্র খান

সদস্য সচিব
তারেকুল ইসলাম

সেট পরিচিতি:
আমিনা সুন্দরী : থিয়েটার আর্ট ইউনিট
শেষের কবিতা : থিয়েটার আর্ট ইউনিট
না-মানুষি জমিন : থিয়েটার আর্ট ইউনিট
ঈর্ষা : প্রাঙ্গণেমোর
মর্ষকাম : থিয়েটার আর্ট ইউনিট
অনুদ্ধারণীয় : থিয়েটার আর্ট ইউনিট ও অনুস্বর
পুলসিরাত : প্রাচ্যনাট

লোগো
মনির মৃত্তিক

কৃতজ্ঞতা
বাতিঘর, রেডলাইন, আরণ্যক নাট্যদল, থিয়েটার আর্ট ইউনিট
প্রাচ্যনাট, প্রাঙ্গণেমোর, অনুস্বর

## শাহীনুর রহমান

জন্ম ১৯৬৯, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালি। চারুশিল্পী, স্থাপত্যশিল্পী, নাট্যকর্মী, কবি, প্রকাশক। শৈশব-কৈশোর কেটেছে খালিশপুর, খুলনায়। সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগ থেকে – যথাক্রমে পেইন্টিং ও ছাপচিত্র বিষয়ে। বাংলাদেশের চারুকলা বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠে স্নাতক পর্যায়ে প্রথম ফার্স্টক্লাস তাঁর। প্রথম প্রদর্শনী করেন ১৯৯৫ সালে, শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম-এ। অংশগ্রহণ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রদর্শনীতে। ১৯তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০০৮-এ তাঁর স্থাপনাশিল্প 'জিরো দ্য প্রাইমারি ইউনিট' বেস্ট মিডিয়া পুরস্কার লাভ করে। বাংলা একাডেমি গ্রন্থমেলা ২০১৭ ও ২০১৯-এ তাঁর 'বাতিঘর স্টল স্থাপনা' সেরা শিল্পীত স্থাপনার স্বীকৃতি পায়। প্রচ্ছদ করেছেন, বেছে বেছে, শতাধিক গ্রন্থের। বেশ কিছু লিটল-ম্যাগ দলের সাথে যুক্ত থেকেছেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনায়। ঢাকার মঞ্চের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের সৃজনশীল সেট-রূপকার তিনি।

## শাহীনুর রহমান

জন্ম ১৯৬৯, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালি। চারুশিল্পী, স্থাপত্যশিল্পী, নাট্যকর্মী, কবি, প্রকাশক। শৈশব-কৈশোর কেটেছে খালিশপুর, খুলনায়। সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগ থেকে – যথাক্রমে পেইন্টিং ও ছাপচিত্র বিষয়ে। বাংলাদেশের চারুকলা বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠে স্নাতক পর্যায়ে প্রথম ফার্স্টক্লাস তাঁর। প্রথম প্রদর্শনী করেন ১৯৯৫ সালে, শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম-এ। অংশগ্রহণ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রদর্শনীতে। ১৯তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০০৮-এ তাঁর স্থাপনাশিল্প ‘জিরো দ্য প্রাইমারি ইউনিট’ বেস্ট মিডিয়া পুরস্কার লাভ করে। বাংলা একাডেমি গ্রন্থমেলা ২০১৭ ও ২০১৯-এ তাঁর ‘বাতিঘর স্টল স্থাপনা’ সেরা শিল্পীত স্থাপনার স্বীকৃতি পায়। প্রচ্ছদ করেছেন, বেছে বেছে, শতাধিক গ্রন্থের। বেশ কিছু লিটল-ম্যাগ দলের সাথে যুক্ত থেকেছেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনায়। ঢাকার মঞ্চের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের সৃজনশীল সেট-রূপকার তিনি।

## সূচিপত্র

# একটা শাহীনুর রহমান

## সেলিম মোজাহার

হরিতকি বনে, সবুজের সনে, রসকলি মন্দিরা বাজায়
তুমিও ভাসিছো ভাবে, বুঝি তুমি ভেসে যাবে
অধরা সেই ভাবের গঙ্গায়!

### ১. সঙ্গদোষে লোহা ভাসে

একটা শাহীনুর রহমান। জন্ম গত শতকের গণ-অভ্যুত্থানের বছর – ১৯৬৯। চিত্রশিল্পী, নাট্যকর্মী, লেখক, প্রকাশক, সংগঠক, পর্যটক এবং পেশাদার আর্ট-ডিজাইনার। খুব ঘনিষ্ঠমহলে খোলামেলা, বাঙময়, উচ্চণ্ড, দিলদরিয়া মানুষ; লোকসমাগমে রক্ষণাত্মক, মিতবাক, পরিমিত, আবদ্ধ। এ-দুয়ের সঙ্গতি দিতে, ঘুরে বেড়ায় দেশের এখানে-ওখানে – দেশের বাইরেও – ছড়িয়ে নিতে নিজেকে – আর, স্থানকালে যুক্ত হতে। জীবন, জীবনাদর্শ, জীবনাচারে আমাদের সময়ের বেশিরভাগ আধুনিকের মতো শাহীনুরও দ্বন্দ্বময়। শাহীনুর আস্তিক – এমনকি এগ্নস্টিকতার ঝোঁকও ওর মধ্যে নেই। সর্বপ্রাণ-বহুত্ববাদী এক মরমি-মিস্টিক ভাবাদর্শ, ভাবচেতনা সেই আস্তিকতায়, বিশ্বাসে – তবে সে আচারিয়া ধার্মিক নয়। অফিসে, কাজের ঘরে, তার একলাকাল দখল করে রাখে ভারতীয়, দক্ষিণ এশীয় সাধনসঙ্গীতের নানা মার্গ – এটা ধ্রুপদী ও লোক – উভয়ার্থে। কিন্তু এই মরমি-মিস্টিক সমন্বয়-আপসবাদী শাহীনুরের সমাজাদর্শ সমাজতান্ত্রিক সাম্য এবং সেটা অনুশীলন মেনেই। শাহীনুর রহমানের পেশাদার কর্মযোগের একটা বড়ো প্রান্ত তেমনসব চেতনাদর্শের সংযোগে-সম্পর্কে। আবার এই শাহীনুর রহমানই ভাব-সংযোগী। সমাজে-সামাজিকতায় তার বিনীত-কুণ্ঠিত থাকা, সে-কারণে, কেবল তার অনভ্যাস হিসেবে দেখা যাবে না। কথা দিলে কথা রাখে শাহীন। দায়পালনে সুচারু সে। তুচ্ছ [কমার্শিয়াল] থেকে সিরিয়াস – যেমন কাজই হোক – তার মনঃসংযোগ সরে যায় না – এটা তার কাজ, এটা তাকে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সবচে বড়ো কথা – এটা আর্ট। এখানে সে, একেবারেই সুস্থির।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রামে প্রায় আট বছর ছাত্রজীবনকাল কাটানোর আগে শাহীনুরের জীবন লম্বাসময় পাড়ি দিয়েছে খুলনায়। বাবার চাকুরিসূত্রে [চার বছর বয়সে] জন্মভূমি নোয়াখালির বেগমগঞ্জ ছেড়ে খুলনা পাড়ি জমিয়েছিল তার পরিবার। ট্রান্সফার-অনীহ তার বাবা ক্রমশ সেখানেই অস্থাবর থেকে স্থাবর হয়ে যান। খুলনায় শৈশব-কৈশোর শাহীনুরের হল্লা করে কাটেনি। একটা সরকারি কলোনির পরিসর-পরিধিতে অনেকটা আত্মমগ্ন, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ছিল কালটা – আর আট-দশটা শিশু-কিশোরের মতো মফস্বলীয় হুল্লোড়ের ছিল না সেই শৈশব-কৈশোর।

বহুধা-পরিচয় শাহীনুর রহমানের পরিচয়ের একটা ভরকেন্দ্র আছে – সেখানে সে শিল্পী। এবং সেখানেও বিভিন্ন – চিত্রশিল্পী, রেখাচিত্রশিল্পী, স্থাপনাশিল্পী, নকশাশিল্পী, গ্রন্থশিল্পী। গম্ভীর, আত্মমগ্ন এক শৈশব-কৈশোর কাটানো শাহীনুর উচ্চমাধ্যমিকের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে 'পেইন্টিং' পড়তে যায় ১৯৮৮-৮৯ সনে। জীবনের হঠাৎ একটা ঢেউ ওকে এনে আছড়ে ফেলে মুর্তজা বশীর [১৯৩২], মনসুর উল করিম [১৯৫০], অলক রায় [১৯৫০], ঢালী আল মামুন [১৯৫৮] – এমনসব নামজাদা শিল্পীর সামনে। আর্ট শাহীনের কাছে আর্টে
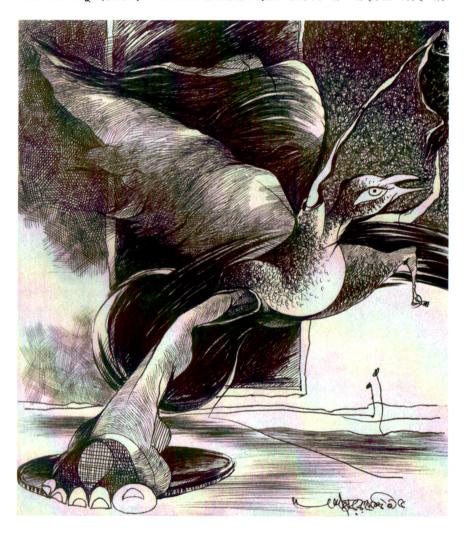
পড়ার চেয়ে বেশি মানে নিয়ে হাজির হলো, শাহীনের মতে, তাঁদের জীবনস্পর্শে। চারুকলা বিভাগে শাহীন 'পেইন্টিং' নিয়ে স্নাতক সম্মান পড়ছে। কিন্তু তার শিল্পীসত্তাকে প্রায় গ্রাস করে রাখছে 'ড্রয়িং'। ড্রয়িংই তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠছে। ড্রয়িংয়েই সে আকার-নিরাকার উভয়কে আকার দিতে চাচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে চেষ্টা-তদবির করেই, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শাহীন ঠিকই পেইন্টিং ছেড়ে প্রিন্ট মেকিংয়ে। ড্রয়িং ও লাইননির্ভর এচিং, মিজোটিন্ট, আকুয়্যাটিন্ট, উড, লিনো এ-সব মাধ্যমে তার স্বভাব কিংবা ঝোঁক একটা ঠিকানা খুঁজে পায় এতে করে। শেষত দেখা যায়, ড্রয়িংই তার শিল্পযাত্রায় বেশ কয়েকটি [অন্তত তিনটি] আলাদা বৃত্ত তৈরি করে দিচ্ছে। শাহীন ড্রয়িং-অন্ত আর্টিস্ট – রেখাশিল্পী, রেখাচিত্রী – লাইন তার প্রধান আশ্রয়। শ্রেণিকক্ষের অনুশীলনী, ব্যক্তিগত ড্রয়িং খাতা – মূর্তে-বিমূর্তে, অবয়বে-নিরবয়বে লাইন বা রেখার দখলে। এটা এমন এক আকারসাধনা, যেখানে ফর্মটাই সাবজেক্ট। আর্টের ক্ষেত্রে শাহীনের শিল্পীসত্তার এই অঙ্কুরবোধ দূরপ্রভাবী হবে।

লক্ষ করছি, আমরা শাহীনুর রহমানের নাম-পরিচয়, জীবন-জীবনাদর্শ ধরে ইতোমধ্যে শিল্পী শাহীনুরের শিল্পকর্ম জগতে কোনো উপ-ভূমিকা ছাড়াই ঢুকে পড়েছি। লাইন ও ড্রয়িং – লাইন-ড্রয়িং। গভীরে ভাবতে গেলে, এটা একটা দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা। আধারটা আধেয়, আবার আধেয়টা আধার। শাহীনের শিল্পীজীবনে এই ভাবটা ভর করে থাকে তার পেইন্টিং পড়াকাল থেকে চট্টগ্রাম অধ্যায়ের পুরোটা। এবং প্রথম সচেতন ভাবনা হয়ে আসে তার 'ঘোড়া-সিরিজ' নামের একগুচ্ছ ড্রয়িং-এ – বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক অনুশাসনের কালেই। পর্বটিতে শাহীন অসংখ্য ঘোড়ার ড্রয়িং করছে। ঘোড়া বা অশ্বের ক্ষিপ্রতা, গাম্ভীর্য, চাপল্য, আভিজাত্য ও শক্তিকে নানা ভঙ্গিতে, নানা ভাঙচুরে ধরার চেষ্টা করছে। রেখাচিত্রীর আধার একটা ভাবনাকে আধেয় করছে। 'অশ্বশক্তি' নামের ব্যবহারিক মিথটি তার ড্রয়িং-এর সাবজেক্ট – তার শিল্পীজীবনের প্রথম সচেতনবৃত্ত। যেখানে, একটা আধারে, একটা আধেয়, পরিণত-রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে – দ্বৈতাদ্বৈত [দার্শনিক-অর্থে] সম্পর্ক ও সত্তা নিয়ে। সিরিজে, এমন একটা শক্তিকে আবিষ্কার ও উদ্বোধনের চেষ্টা – যে-শক্তিটা কোথাও প্রয়োজন। এক পরিণত, গম্ভীর, ক্ষিপ্র, তেজোময় শক্তি; যে তার দুরন্ত গতিতে কোনো কিছু মিলিয়ে দেবে এক ঝটকায়। কিন্তু, রসাস্বাদীরা যখন ঘোড়া সিরিজ পাঠ করবেন, 'অভ্যন্তরে উর্ধ্বলোক যাত্রা' নামে, আরেকটি দুয়ার খুলবে – সেটা পঙ্খিরাজ, দুলদুল হয়ে কোনো এক অধিবিদ্যায় টানবে আমাদের –

শাহীনের শিল্পীজীবনে যে-অধিবিদ্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। শিল্পী শাহীনুর চাইবে বস্তু ও বাস্তবের, সময় ও আকারের ভিতর দিয়ে অবস্তু ও অতীন্দ্রিয়ের, নিত্য ও নিরাকারের তালাশ পেতে। এই মেটাফিজিক্স উপস্থিত থাকে তার শিল্পীজীবনের একটা স্থায়ী প্রবণতা হিসেবে। ঘোড়া সিরিজের আগে-পরে, রেখাচিত্রী শাহীনুর তার লাইন ড্রয়িংয়ে ছয় শ'র কমবেশি ড্রয়িং করেছে। যেগুলোতে দুটি মৌলিক চিন্তাবৃত্ত আছে।

ড্রয়িংগুলোর থিম মানুষ। মানুষগুলোকে শাহীন দুটি আলাদা পটে দেখছে – গ্রামীণ ভূচিত্রে [ল্যান্ডস্কেপ] এবং নগর-ভূচিত্রে [সিটিস্কেপ]। রেখাচিত্রগুলোর পটভূমি যখন গ্রাম ও প্রকৃতি, সেখানে মানুষগুলো প্রকৃতির কমনীয়-কোমলে লীন হয়ে যাবার বাসনা নিয়ে হাজির। মানুষগুলো প্রকৃতি হয়ে প্রকৃতিতে মিশে যেতে চায়। অথবা প্রকৃতি হয়ে যাবার অবিরাম চেষ্টা তাদের। আবার পটভূমি যখন সিটিস্কেপ বা নগর, তখন সেটা বিপরীত। এখানে তুমুল এক ভাঙচুরের ভিতর অসংখ্য মেটাফর। রাস্তা, নালা, ইঁদুর, বেড়াল, টিকটিকি, পোল, পোস্ট, তার, দেয়াল, দালান, গলি, ঘিঞ্জির ক্যাওয়াসে মানুষেরা আছে – খণ্ডিত, গলিত, ছিন্ন, নগ্ন, ঝুলন্ত, পড়ন্ত, বীভৎস, বিসদৃশ; লিঙ্গ, যোনী, স্তন, স্কন্ধ – সেখানে উল্টেপাল্টে একাকার। এ-ওকে খাচ্ছে, ও-তাকে গিলছে; এর ঘাড়ে ওর ঝাঁপ তো, ওর ঘাড়ে তার লাফ – হতাশায়-বিষাদে মরিয়া দশা মানুষগুলোর।

মানুষগুলো পালাতে চায় এই বন্দিদশা থেকে। পালাতে তারা পারবে কীভাবে? চারদিক থেকে ঘিরে আছে তাদের অসংখ্য ক্যামেরা বা চোখ। এসব চোখের সামনে থেকে কীভাবে পালাবে তারা? রুরাল ল্যান্ডস্কেপের জাক্সটাপোজ এটা। অন্ত-আধুনিকতা কালের ড্রয়িংয়ে যেমন, গ্রাম-নগর একে অপরের ভিতর ঢুকে-সেঁধে একাকার, তেমন নয়। শাহীনুরের রেখাচিত্রে এ-দুটো চিত্রধারা অবিমিশ্র। দুটো ধারণাবৃত্ত একে অপরের কন্ট্রাস্ট। কিন্তু রুরাল ল্যান্ডস্কেপের কোমল, মিস্টিক প্রাণ-প্রতিবেশ যেমন, তেমনি সিটিস্কেপের রুদ্র-নির্মম অমিস্টিক অপ্রাণ-প্রতিবেশ – উভয় রেখাচিত্রে শাহীন বিমিশ্র লাইন ব্যবহার করেছে – বিমিশ্র পূর্ব-পশ্চিম। এটা শাহীনের এ-ধারার কাজের ইউনিকনেস, ইউনিটি – সমকালীন শিল্পীদের ড্রয়িংয়ে এটা সহজলভ্য নয়। ল্যান্ডস্কেপ-এর ফিগার ও ফিগারের এনাটমিতে ওয়েস্টার্ন লাইন ব্যবহৃত হচ্ছে, আবার যখন প্রাণ-কোমলতার বিষয় আসছে, ব্যবহৃত হচ্ছে ওরিয়েন্টাল লাইন। এটা পাওয়া যাবে সিটিস্কেপ ড্রয়িংয়েও – সেখানেও, ফিগার ও তার এনাটমিতে পশ্চিমা লাইন, আবার প্রাণ-কারুণ্যের ডিটেলে প্রতীচ্য লাইন।

পেইন্টিং থেকে ড্রয়িং; ড্রয়িং থেকে শাহীনের একটা মন একপর্যায়ে, ক্রমশ, স্থাপনাশিল্প বা ইন্সটলেশন-এ সরে আসে। গত দশ থেকে পনেরো বছর শাহীন ইন্সটলেশনে বেশ কিছু কাজ করেছে। ১৯ তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী [২০০৮] এ্যাওয়ার্ড তার ইন্সটলেশনেই। কাজটার নাম ছিলো, 'জিরো দ্য প্রাইমারি ইউনিট'। স্থাপনাশিল্পটি 'বেস্ট মিডিয়া' স্বীকৃতি-পুরস্কার লাভ

করে সেবার। শিল্পকলা একাডেমির খোলা চত্বরে মেটালিক-রোবোটিক একটা স্থাপনা। একটা মানুষ। সিলিঙে তার পা দুটো ঝুলছে। নিচে মেঝেতে পড়ে আছে তার হার্ট বা হৃৎপিণ্ড। উপরে যে-কপিকলে পা-দুটো বাঁধা, সেখান থেকে একটা গঁ-গঁ ঘুর্ণন শব্দ আসছে। নিচেপড়া হৃৎপিণ্ডে পালপিটিশন। একটা লাইট ঝুলছে ঝিলিক মেরে মেরে, ঘুরে-ঘুরে, অ্যাম্বুলেন্সের লাইটের মতো – ওপর থেকে। মানুষটা ঝুলে আছে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জিরো-পয়েন্টে। নূর হোসেন চত্বর। যে-পয়েন্টে হার্টটা পড়ে আছে। যেন একটা শক্তিকেন্দ্র। জিরো পয়েন্টেরই ৩৬০ ডিগ্রির নানা দিকনির্দেশক বৃত্তটাকে, ৪৫ ডিগ্রি বিভাজনে মোট আটটি ফটোগ্রাফে ধারণ করে শাহীন। চিত্রগুলো ব্যবহৃত হয় মূল মেটালিক স্থাপনার চারপাশে। যেটা মূল স্থাপনার ডিফিউজ্‌ড্ শক্তিকে নানা ডিরেকশনে পথ দেখায়। সেই নির্দেশ তেতুলিয়ার দিকেও হতে পারে, টেকনাফের দিকেও হতে পারে। ইতিহাসের দিকেও হতে পারে, আবার জ্ঞানের দিকেও হতে পারে। শিল্পানুভূতির দিকেও হতে পারে; আবার হতে পারে বিভূতির দিকেও । পার্শ্বদেয়াল হিসেবে ব্যবহৃত চিত্রগুলোতে তেমন নিদের্শনা – টুকরো কথা, কাব্য, চিত্র, জ্যামিতি, গণিত, সূত্র, সূক্ত ইত্যাদি মানবিক করণ-সমাচার। অসংখ্য নির্দেশে অসংখ্য পথ, পথগুলোর কেন্দ্র বা ভর জিরোপয়েন্ট – যেখানে হৃৎপিণ্ড। শাহীনুরের ঘোড়া-সিরিজের [এককালে] 'অভ্যন্তরে ঊর্ধ্বলোক যাত্রা'র চিন্তা আরও পরিণত দশা পায় 'জিরো দ্য প্রাইমারি

ইউনিট'-এ। বহুপথ-বহুমত বহু দিকে যায়, দিন শেষে ফিরে আসে – শূন্যে হারায় – শাহীনুরের 'জিরো পওয়ার'। শক্তিটা শূন্যের শক্তি – শূন্য নিরাকার – বহুপথে, বহুমতে সে আকার পেয়েছে। দ্বৈতাদ্বৈতে শাহীনের যাত্রা একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলে। একটা পরিণত দার্শনিকবোধে দাঁড়ায় তার। খুব সচেতনভাবেই সেটা টেকনিক ও চিন্তা – উভয়ার্থে – দ্বৈতাদ্বৈতে। স্থাপত্যধারায় শাহীনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এশিয়ান আর্ট এক্সিবিশনে প্রদর্শিত 'ইন সার্চ অব ফেয়ার মেনিপুলেশন'।

প্রসঙ্গ ঘুরে আবার আগের জায়গায় আসবো। ঢাকার জীবন [১৯৯৬-৯৭] শুরু হবার কিছুকাল পর থেকেই নাটকের দল 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট'-এর সাথে শাহীনুর রহমানের সম্পর্ক। এ-সংযোগ, আর্টিস্ট হিসেবে আর্টের একটি বিশেষ শাখায় নিছক কর্মসংশ্লিষ্টতা নয় – সেখানে, একজন মানুষের আদর্শিক বিশ্বাসের প্রতি তার আগ্রহটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকার এস এম সোলায়মান শাহীনুরের কাছে সেই আদর্শবৃত্ত। এস এম সোলায়মানের 'মিউজিকাল-রাফ' নাট্যচেতনা শাহীনুর রহমানের সাংগঠনিক আগ্রহকে সক্রিয়তায় নিয়ে গেছে। যেখানে নাটক মানে কেবল আর্ট নয় – সময়, সমাজ, দেশ, দেশের মানুষ – তার রূপ-রঙ-প্রকৃতি; তার জীবন ও সংগ্রাম – এবং বিশেষত সমকালীন। এস এম সোলায়মানের নাট্যকাঠামো ও নাট্যচিন্তায় যে-বিপ্লবী বদলের চেতনা, প্রতিষ্ঠানবিরোধী চেতনা – সেটা শাহীনের আগ্রহের জায়গা। তবে, এটা ঠিক যে, প্রতিষ্ঠানবিরোধী একটা চেতনা শাহীন পেয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের ছাত্র-জীবনাচারে। সাথে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের সাথে কর্ম-সংযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে চারুকলা বিষয়ে পাঠ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং চট্টগ্রামের নানা সাংস্কৃতিক বলয়ে কর্মযোগ ভর পেয়েছিল তার ঢাকাকেন্দ্রিক নাট্যসংযোগ 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট'-এর গললগ্ন চেতনা ও ভূমিকায়। একসময় চট্টগ্রামকেন্দ্রিক ও চট্টগ্রামের বাইরের নানা লিটল্ ম্যাগ বৃত্তে শাহীনের মুখর উপস্থিতি, আর্ট ও ডিজাইন নিয়ে। এ-সব সংযুক্তি বিকশিত ও বিস্তৃত হয়েছে কেবল 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট' নয়, শিল্পকলা একাডেমিসহ নানা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, দলের, সংঘের সাংস্কৃতিক কাণ্ডে একাকার হয়ে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা স্বেচ্ছাসেবা নিয়ে। এ-সময় থেকেই শাহীন, নিজ দলের পাশাপাশি অন্য অনেক নাট্যদলেরও আর্ট-ডিজাইন, প্রচার, প্রকাশ ইত্যাদিতে নীরব-উদার সাড়া দিয়ে গেছে – দিয়ে চলেছে যা এখনো।

দ্বৈতাদ্বৈত নিয়ে কথা হলো, এস এম সোলায়মান প্রসঙ্গ এলো, অথচ সেলিম আল দীন উল্লেখই হলো না [!]। এ-পর্যায়ে আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। শাহীনুর রহমানের বহুধা কর্মতৎপরতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি প্রকল্পনা 'দ্বৈতাদ্বৈত টেক্সট'-ধারণাটি প্রসঙ্গ যখন। বরং সরাসরি চলে যাই। শিল্পতত্ত্ব হিসেবে 'দ্বৈতাদ্বৈত' নাট্যগুরু সেলিম আল দীনের জীবনের শুরুর দিকের তত্ত্বপ্রস্থান নয়। এ-শিল্পতত্ত্ব তাঁর পরিণত বয়সের পরিণত কর্মকালে। অপরিণত বয়সের সেলিম আল দীন এবং তাঁর সহযাত্রীগণ একদা সমাজ-স্বদেশ জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে

বাঙলানাটকের এমন একটা রীতি-রূপ তথা আধার খুঁজছিলেন, যেটা বাঙলানাটককে রূপের দিক থেকে ইয়োরোপীয় নাট্য-ইতিহাস, নাট্যসংজ্ঞা, নাট্য-প্রয়োগ এমনকি নাট্যাদর্শ থেকে বিমুক্ত করে। এটা ছিল বাঙলা থিয়েটারের পরিবেশনারূপ তথা আকারসন্ধান। তাঁরা একটা সমাধানও পেলেন। সমাধানটা সহজ ভাষায় এ-রকমঃ তাঁরা বাঙলার প্রায় দু-আড়াই হাজার বছরের সম্ভাব্য নাট্য-উপাদান, নাট্য-ইতিহাসের পটভূমিতে বাঙলার [বর্তমান] শত শত স্থানীয় পরিবেশনাকে পাঠ করে একটা সারকাঠামো দাঁড় করান। এ-সারকাঠামোয় কথা বা সংলাপ, ন্যারেশন বা বর্ণনা, গান, নাচ, ভান বা অভিনয়, দৃশ্য – ইত্যাদি মৌলিক স্থায়ী আকার হিসেবে নির্দিষ্ট হয় – নাট্যশাস্ত্রে ভরত মুনি অন্যান্য আর্ট থেকে নাটককে শিল্প বোঝাতে যে-কথা বলেছিলেন। নাট্যকার সেলিম আল দীন ও তাঁর সহযোগীগণ বাঙলার স্থানীয় পরিবেশনাগুলোর 'কমন' বৈশিষ্ট্যগুলোকে বাঙলানাটকের 'সারধর্ম' হিসেবে 'একাকারে' ধরতে চাইলেন। তাঁদের প্রকল্পিত দেশজ নাটলিপি আকার খুঁজে পেলো। তাঁরা খুঁজে পেলেন এমন একটা নাটলিপি বা টেক্সট-এর ধারণাকাঠামো, যে-কাঠামোয় অনেক রূপের একিকরণ ঘটে। এটা প্রচলিত একাঙ্গিক ইয়োরোপীয় টেক্সট বা নাটলিপির ধারণাকে পরিহার করে। এ-সম্মিলিত যাত্রা থেকে পাওয়া নাট-প্রকরণ বাঙলানাটকের মিসিং লিঙ্কটাকে পাইয়ে দেয়। তাঁরা তাঁদের কাঠামোটার নাম দিলেন – বর্ণনাত্মক নাটক বা কথানাট।

কিন্তু এ-উত্তরণ রেখা ধরে নাট্যকার সেলিম আল দীন, তাঁর পরিণত বয়সে আরও একটু উত্তরিত হতে চাইলেন তাঁর 'দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পতত্ত্ব' নিয়ে। বলা ভালো, এটা সেলিম আল দীনের ব্যক্তিগত দার্শনিক লম্ফন বা উত্তরণ – তাঁর সহযাত্রীদের নয়। এ-শিল্পতত্ত্বের দার্শনিকতা তৈরিতে সেলিম আল দীনের কাছে সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল প্রাচ্যদেশীয় কৃত্যশাসিত ভাব আর আস্তিক ভারতীয় বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত। বৈদিক ব্রহ্মাই শূন্য থেকে নানা আকারে-প্রকারে বিকাশি-প্রকাশি আবার নিরাকারে হারায়। তাই সে, এক হয়ে বহু, বহু হয়ে এক। সেলিম আল দীন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শনে ইসলামি ঔদার্যের সুফিভাব মেশানো, বেদান্তের অবশেষ বৈষ্ণব-চৈতন 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'কে তাঁর শিল্পতত্ত্বের দার্শনিকভাব হিসেবে গ্রহণ করেন সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বচেতনায়। এ-চেতনাপর্যায়ে সেলিম আল দীন তাঁর অবজেক্টিভ ন্যারেটিভে সাবজেক্টিভ উপাদানরাশি পুরে দিতে থাকেন [প্রাচ্য, হরগজ, ধাবমান, নিমজ্জন, পুত্র]। নানা প্রাণ-প্রাকৃতিক, ভাববাচক উপাদানের আরোপ ঘটতে থাকে তাঁর টেক্সট-এ। সৌন্দর্য, ক্ষমা, প্রাণ, প্রীতি, শূন্য, নিত্য, মহাকাল, চক্র এইসব বিমূর্ত-চেতনানুষঙ্গে কুয়াশা-কুহক হতে থাকে তাঁর বর্ণনা। আর আমরা কেউ কেউ, বর্ণনাত্মক নাটক আর দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পতত্ত্বকে 'এক মাল' ভেবে ভক্তি-ক্ষমা, পানা-ফরিয়াদি এক সম্মিলনী মঙ্গলাবেশে দেখার দ্বিধায় পড়ে যাই।

বাঙলা নাটকের রূপের সন্ধানে নেমে, নতুন এক শিল্পতত্ত্বের নামে প্রাচ্যভাবের [গুণের] ফাঁদে পড়া সেলিম আল দীনের দ্বৈতাদ্বৈত নিয়ে আলোচনাটা দরকার ছিল। গত তিন বছরকাল



শাহীনুর দ্বৈতাদ্বৈত প্রয়োগকাঠামোয় এমন একটা 'টেক্সট' তৈরি ও প্রকাশের তৎপরতায় দীরস্থির। যে-টেক্সট লেখনের সবগুলো মাধ্যমকে ধারণ করবে। কিন্তু সেটা প্রথমত এবং আকারগতভাবে ছাপানো বই, যাকে আমরা 'বুক' বলি। লেখনের অপরসব মাধ্যমঃ শব্দ, চিত্র, চলচ্চিত্র, সুর, সঙ্গীত ইত্যাদি সাংকেতিকসূত্রে যুক্ত হয়ে আরও অসংখ্য টেক্সট-এর সাথে যুক্ত করে দেবে পাঠককে এই 'বুক'। মানে, টেক্সটটি হবে লেখন-সংকেতের দ্বৈতাদ্বৈত কৌশলে। এ-চমৎকার টেক্সট-ধারণাটি নিয়ে শাহীনের দীর্ঘপ্রস্তুতি। জানার ব্যাপার হলো, টেক্সটির কনটেন্ট লাইনও দ্বৈতাদ্বৈত। এই টেক্সট প্রাচ্যদেশীয় সেই ভাবচেতনাকে ধারণ করে, যে-ভাবে জীবন তাৎপর্যহীন নয়, তাঁর একটা মহালক্ষ্য, মহাতাৎপর্য আছে। যে-ভাব প্রকাশ করেঃ জড়ে-জীবে মিলি জগৎ-সংসার – একটাই শৃঙ্খলা, একটাই লক্ষ্য তার। এক মহাকাল, মহাপ্রাণের অঙ্গ, অংশ, খণ্ডাংশ, ছিন্নাংশ আমরা। এ-জগত-সংসারের থাকা না থাকা আমাদের নিয়ে। আমরা আছি বলে সে আছে, সে আছে বলে আমরা আছি। আর তাই পর-অস্তিত্ব, পরপ্রাণ, পরপথ, পরমত, পরজীবন, পরস্বার্থ; সে আমারই স্বার্থ। বিনয়ে-ক্ষমায় সেই সম্মিলনী ভাব। আমরা সবাই মিলে এক। আমরা একের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বহু হয়েছি – সকল বৈচিত্র্য নিয়ে মহাসংসারে আমাদের মহাবন্ধন।

তবে, শাহীনুর রহমান ও সেলিম আল দীনের দ্বৈতাদ্বৈত-যাত্রার বৈপরীত্য হলো, সেলিম আল দীন রূপ খুঁজতে গিয়ে গুণে মুগ্ধ, আর শাহীনুর গুণের ভিতর দিয়ে রূপে বা প্রকরণে। বিশুদ্ধ আস্তিক [অ-প্র্যাকটিশনার], মরমি-মিস্টিক শাহীনুর রহমানের দীর্ঘ দ্বৈতাদ্বৈত-শিল্পযাত্রার একটা প্রান্ত তার নয়া প্রকাশনাদর্শন। এবং তার প্রথম দ্বৈতাদ্বৈত-টেক্সটটির বিষয় 'দ্বৈতাদ্বৈত'। প্রাচ্যের যে-কোনো রচনায়, প্রকাশে; যে-কারো রচনায়, প্রকাশে সর্বপ্রাণবাদী, সর্ব-

অস্তিত্ববাদী, সহগামী, সম্মিলনী ঐক্য-চেতনাদর্শনের প্রকাশ মাত্রই শাহীনুর তার টেক্সট-এর ছিন্নপত্র করতে চায়। এমন অসংখ্য ছিন্নপত্রে গড়ে উঠবে তার দ্বৈতাদ্বৈত টেক্সট। যাতে লিখিত বর্ণনা থাকবে, আঁকা ছবি থাকবে, রঙ থাকবে, শব্দ [সাউন্ড] থাকবে, স্থিরচিত্র-চলচ্চিত্র থাকবে, থাকবে নানা সংযোগসূত্র – কিন্তু তা টেক্সট – যাকে আমরা ছাপানো বই বলি। বইয়ের মূল ন্যারেটিভের ফাঁকে-ফোঁকরে থাকবে নানা বারকোড। বই পড়তে পড়তে বারকোডে গিয়ে দেখে-শুনে আসা যাবে ইন্টার-লিঙ্কড্ অনুষঙ্গ, তথ্য-উপাদান। এই ভবিষ্যবাদী, ফিউচারিস্ট, ডিজিটাল গ্রন্থধারণাটি বৃহৎ পরিসরে সফল হতে পারে। গ্রন্থশিল্পী শাহীনুর সফল হোক তার দ্বৈতাদ্বৈত গ্রন্থধারণায়। ফোর্থ-জেনারেশন শিল্পবিপ্লবকালের টেক্সট-ধারণা হিসেবে এ-লেখনকলা সম্ভবত বিপ্লবী।

স্মরণ করতে চাই, নাট্য-প্রকরণ ও নাট্যচিন্তায় শাহীনুর এস এম সোলায়মানের ‘রাফ থিয়েটার’ ও ‘বাস্তব-স্বকাল’ দ্বারা কর্ষিত। যেখানে সে বিজ্ঞানমনস্ক, নৈর্ব্যক্তিক, ইহজাগতিক ভাব-ভাবনায় মুখর। নানা সংগঠনের সাথে নানা কর্মসংযোগে প্রতিকূল সময়ের বিপরীতেই মাটিতে দাঁড়ানো শাহীনুর। এর উল্টোদিকে ভাব দ্বারা বিচ্ছিন্ন শাহীনুরও আমাদের সামনে বর্তমান। সবকিছুকে, সবাইকে এক ক্ষমাসুন্দর মহা-ঐকতানে দেখে ‘প্রতিরোধী বিকল্পের মুক্তস্বর’টাকে সে হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত করে তাতে। জীবনানন্দ দাশের একটা লাইন স্মৃতি হাতড়ে আনি এখানে, অবিকল নয় – ‘কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে, তৃষ্ণা কারুকর্মীর আজন্মবাসনা আমার সকল সামাজিক সম্ভাবনা বিনষ্ট করেছে।’ মরমি-মিস্টিক ভাবসাধনা, শাহীনুরের কারুবাসনা তো নয়ই, সামাজিক সম্ভাবনাটাকেও যেন বিনষ্ট না করে – যেখানে সে, শ্রমী ও কর্মী – বিজ্ঞান মেনে, বস্তু মেনে, সময় ও স্বকাল মেনে। লালনের মতো, হাসনের মতো, অন্তকালের সেলিম আল দীনের মতো শাহীনুরও যেন বৈদিক-সুফি আস্তিক্যের অবশেষ, পানা-ফরিয়াদে সবটা ডুবে না যায়। ঘোড়া সিরিজ-এর উর্ধ্বলোক যাত্রা, ন্যাচারস্কেপ-এর মানুষ-প্রকৃতির দ্রবণ, জিরো দ্য প্রাইমারি ইউনিট-এর শূন্যতা এবং দ্বৈতাদ্বৈত টেক্সট ও তার দ্বৈতাদ্বৈত কন্টেন্টলাইন – এগুলোকে এক সুতোয় গাঁথলে ভাবদর্শী এক শাহীনুরকে পাওয়া যাবে। চাওয়া শুধু এই, শাহীনুরের ধর্ম-দার্শনিক ভাববিশ্বাস যেন তার সমাজ-সাংস্কৃতিক ভাববিশ্বাসটাকে দখল করে না ফেলে।



**২. সঙ্গলোভে শোলা ডোবে**

সেগুনবাগিচায় বাসার সুবাদে [শাহীনের অফিসের গলিতে] এবং নাটককেন্দ্রিক কিছু তৎপরতায় শাহীনের সাথে ২০১৪'র শুরুর দিক থেকে জীবনটা দৈনন্দিন হয়ে যায়। আমি আর শাহীনুর একসাথে মেলা সময় কাটাচ্ছি। বিচিত্র-বিভিন্ন বিষয়ে কথা হচ্ছে, বৌদ্ধ-শৈব গুনুং পাদাং, এ্যাঙ্কর ওয়াট দেখতে যাবার পরিকল্পনা হচ্ছে; আমার লেখা ‘মহাস্থান দ্য গ্রেট ল্যান্ড’ প্রকাশনার আয়োজন চলছে, শাহীন যার ডিজাইনার; এবং CAIS [counter alternative independent sign : প্রতিরোধী বিকল্পের মুক্তস্বর] নামে সংগঠন গড়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা প্লাটফর্ম তৈরির পরিকল্পনাও হচ্ছে। এর কাছে-পিছে সময়ের একদিন, আর্ট কতটা স্বভাব, কতটা অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন – এমন বিষয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের। একপর্যায়ে, শাহীনকে কেরালান কিংবদন্তি এডমন্ড থমাস ক্লিন্ট [১৯ মে ১৯৭৬-১৫ এপ্রিল ১৯৮৩]-এর কথা বললাম; যে-শিশুশিল্পীটি ২৫ হাজার আর্টওয়ার্ক রেখে ছ-বছরের একটা জীবন কাটিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেছে। এ-সময় নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনয়কর্মী মোহাম্মদ বারীর রচনা-নির্দেশনায় থিয়েটার আর্ট ইউনিটের প্রযোজনা বুদ্ধদেব বসুর গল্প ‘অনুদ্ধারণীয়’ [২০১৮]-এর প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজনকাল। খুব কাছাকাছি সময়ে ‘অনুদ্ধারণীয়’-এর দুটা সেলিব্রেটিং শো হয়, পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর। মুরশিদ কুলি, সিরাজ, মীরজাফরদের কারু-জঙ্গময় ঐতিহ্য ঘুরে-ঘুরে দেখছে শাহীন ঐ-যাত্রায়, একেবারেই এক সহজিয়া ফুর্তিতে, লুঙ্গি-গামছা কোচা মেরে। এর ঠিক পর পর, কুড়ি-পঁচিশদিনের একটা কালপ্রক্ষেপ শাহীনের জীবনে সম্ভবত একটা বাবল্ – এর মতো ছিল। বাবল্-সামান্য সময় বাতাসে ভেসে ফেটে-উবে যায়। এ-সামান্য সময়ে শাহীন ৫০০০ ড্রয়িং করেছে। কালো-লাল-হলুদ-সবুজ-বেগুনি-নীল অবিমিশ্র মোটা কালির দাগে ড্রয়িং। কোনোটার অঙ্কনকাল এক থেকে দেড় মিনিট তো – কোনোটার ৭ থেকে ১০ সেকেন্ড। এক গভীর মগ্নতায় বিপুল অস্থিরতাকে উগরে দেবার ঐ-কালগ্রন্থিটা শাহীনের জীবনে অন্যরকম। অনন্য ঐ-বাবল্ ডেজ! একদিনে আস্ত একটা ডায়েরি শেষ করছে সে। কী আঁকছে; কী তার মূল্য, কী তার ভূমিকা এতসব ভাববার অবসর নাই। মৃত্যুটা কি কাল সকালে? নাকি দুয়ারে যমদূত? কিছু মুখ, আধাভাঙা মুখ, নারী-পুরুষের মুখ, পরিচিতজনের মুখ – টুকরো, জ্যামিতিক, অর্ধাভাস, অবভাস; ফুল-পাখি, আল্পনা-উল্কি – কখনো তারাই মুখ, মানুষের মুখ, শাহীন এঁকে যাচ্ছে। সাথে, সামনে বসা যে-কারো প্রতিকৃতি; যাকে আমরা পোর্ট্রেট বলি – কখনো মনেপড়া কারো। ডিটেলের ধার ধারছে না সে। রিয়ালিস্টিক নিখুঁতের ধারে-কাছে নেই – ঐ-মুখ তার খেয়ালে যেমন ধরছে তেমনটাই – আঁকার সময় যে ৭ থেকে ১০ সেকেন্ডের বেশি নয়। তাত্ত্বিকেরা স্টাইল করে বলতে পারেন, ইট ওয়াজ আ টাইম অব এক্সপ্রেশনিস্ট ডিস্টর্শন – কিন্তু, যে-আমি, আমাদের বৌদ্ধিক জগতে, বিজ্ঞানমনস্কতার অন্যতম বিপ্লবী আইকন, আহমদ শরীফের গদ্যেও বুর্জোয়া মানবতাবাদজাত বুদ্ধিবাদী ভাবগুলোকে আলাদা করে দেখতে অভ্যস্ত – দেখেছিলাম অন্য কিছু – যার নাম সেই ভাবগ্রস্ত প্রেরণা। এ-সময়টাতে শাহীন ক্লিন্ট-এর মতোই প্রেরিত একজন। ক্লিন্ট-এর প্রভাব? হয়

তো, হয় তো নয় – কিন্তু তারই মতো – প্রেরণায়-স্বভাবে – আঁকাটায় আঁকার মনোযোগও নেই – আঁকাটা তখন সময় আর স্বভাব – কিংবা সময়টাই সেখানে শূন্য। শাহীনকে একটা যুদ্ধ সেরে নিতে দেখছিলাম তখন – একা, বিযুক্ত; থেকেও নেই, আনমনা, কখনো হঠাৎ সংক্ষুব্ধ – যেন একটা কিছুকে পিছনে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেটা হঠাৎই বেরিয়ে আসতে চায়। এ-'বাবল্ টাইম' শাহীনের জীবনে ঘুরে-ফিরে আসুক – একটু স্থৈর্যের সাথে।

একটু পিছনে সরি। 'নাটবাঙলা' নিয়ে জামিল স্যারের সাথে শিল্পকলা একাডেমি ও সাভার ওয়াইএমসিএতে দুটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যকর্মশালাসহ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার-এ বেশ কয়েকটি সেমিনার ও সংলাপ আয়োজন করেছিলাম ২০১৪ থেকে – যার অনেকগুলোর প্রচার-প্রদর্শনী ছিল শাহীনের রূপায়ণ। আমরা তখন 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট'কে সাথে নিয়ে একটা রেপাটরি নাটকের কথা ভাবছিলাম 'নাটবাঙলা' থেকে, স্যারের নির্দেশনা-পরিকল্পনায়। সুযোগটা শেষ পর্যন্ত নানা জল গড়িয়ে এসে গেলো। বাংলাদেশের থিয়েটারে, নাটগুরু সৈয়দ জামিল আহমেদের অমর রচনা 'রিজওয়ান' [২০১৭]-এর লোগো, পোস্টার, টিকিট, প্রকাশনাসহ সবরকম প্রমোশনাল ডিজাইনের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছিল শাহীনুর। সেই অসাধারণ 'রিজওয়ান' ক্যালিগ্রাফিটি [যা বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছিল] – 'রিজওয়ান লোগো' হয়ে এখনও থিয়েটারপ্রেমী ফেসবুক ইউজারদের কারো কারো প্রোফাইল হয়ে আছে।

'রিজওয়ান' প্রসঙ্গ যখন এলোই, একটু খানিক প্রসঙ্গে থাকি। লোগো-টিকিট-পোস্টার-প্রকাশনাসহ 'রিজওয়ান'-এর প্রমোশনাল ডিজাইনগুলো করছে শাহীন। 'রিজওয়ান' তখন প্রথমবার সাভার আবাসিক-ক্যাম্প সেরে এসেছে তিন রাত চার দিনের। নাটকের রান থ্রু হয়েছে দু-একটি। একদিন আমাদের, আমরা যারা প্রডিউসার বা বিনিয়োগকারী বা পিছনের লোক কিংবা দ্বিতীয় বা অপরপক্ষ তাদের ডাক পড়লো নাটকের রান-থ্রু দেখতে। শাহীনকে তো যেতেই হবে, কারণ সে নাটক দেখে, নাটক বুঝে নাটকের প্রচার-প্রকাশনা নকশা করবে। আমরা রান থ্রু দেখছি। রান-থ্রু চলছে। স্যার নেপথ্য কথনের মতো একতলা মহড়াকক্ষে নাটকের ঘটনাগুলোকে শিল্পকলার এক্সপেরিমেন্টালের তিনটা-স্তরে নিচুস্বরে বর্ণনা করে চলেছেন। রান-থ্রু শেষ হলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্যার জানতে চান, কেমন বা কী। আমরা মুখ খুলতে না খুলতেই স্যার কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে, 'ক্রিটিক বনে যেয়েন না' – আবার মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হয়ে বলেন, 'শিল্পীরা এমন

হয়। এটা ক্রিয়েটিভ প্যাশন।' তো আমরা রান-থ্রু দেখে শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশালা-গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে। শাহীন চুপচাপ। আমিও। শাহীন বললো, 'এ-নাটক একটা কারণে গিনেস রেকর্ড করবে। নিশ্চিত।' আমি প্রশ্ন নিয়ে তাকাই। শাহীন স্মিত হেসেই বলে, 'পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে গ্রিক-পরবর্তীকালে সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো পুরুষাঙ্গ দেখানোর ইতিহাস। দিউনিসাসের আর শিবলিঙ্গের পর ছয় ফুটের এক আদম এ-নাটকে আস্তটাই লিঙ্গ'–তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললো, 'জামিল আহমেদ, দ্য মাস্টার ডিজাইনার!' আমি বললাম, 'এটা কি লাঁকানিয়ান বাসনাকেন্দ্রিক ক্রিটিক?' সে বললো, ডিজাইনের পাওয়ারটাও সাথে যোগ হবে।

স্থাপনাশিল্পের আর্ট-ডিজাইনার শাহীনুরের চোখে ঐ-দৃশ্যটির স্থাপনা এবং স্থাপনাটির পুনরাবর্তন একটা কমপ্লিট ইন্সটলেশন-এর ধারণা তৈরি করে। সাবজেক্টের চেয়ে ডিজাইনটা আগে আসে তার কাছে। একটা স্থাপত্যকলা কাঠামো পেতে থাকে তার মাথার ভিতরে। ডিজাইনার শাহীনুর। শাহীনুরের কোনো এক স্থাপত্যকলায় যেটা হয়তো আমরা দেখবো। আরও একটু পিছনে যাই। ১৯৯৬-৯৭-এর দিকে ঢাকায় চলে আসে শাহীনুর চট্টগ্রামের পাঠ ও পাট চুকিয়ে। শাহীনুর এবং তার বন্ধুরা 'ডিঙ্গা' নামে একটা ডিজাইন হাউজ খুলে যখন পেশাজীবন শুরু করে, সত্যি বলতে ঢাকায় তখন ডিজাইনের জন্যে পনেরো-বিশটার বেশি অ্যাপল মেকিনটোশ ব্যবহার হচ্ছিল না। ঐ-সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, শাহীন আর্ট ডিজাইনটা আর ছাড়েনি। কখনো কোনো চাকুরির দরজায়ও দাঁড়ায়নি সে। পেশাদার আর্ট ডিজাইন এবং রিয়েল আর্ট [ড্রয়িং-মঞ্চ-স্থাপনা]–দুয়ে মিলে তার জীবন। এককালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগে গুরুদের সতীর্থ হবার বাসনা হয়েছিল, ঐ-পর্যন্তই। তবে, নেশা-পেশা এক হওয়াতে খুব কিছু মঙ্গল হয়েছে সেটা হয় তো বলা যাবে না। কমার্শিয়ালের চাপ ও ব্যস্ততা, বন্ধুজন সহায় – এ-সব মেটাতে-মেটাতে, রিয়েল আর্টে তার নিমগ্ন লেগে থাকার সুযোগ থাকেনি। কিন্তু দায়িত্বশীল, নির্ভরশীল, সৃজনশীল, পেশাদার আর্ট-ডিজাইনার হিসেবে শাহীন নাম কুড়িয়েছে। বাতিঘর-এর চট্টগ্রাম আউটলেট যখন ডিজাইন করছে, সেখানে ব্যবহার করছে জাহাজের উপাদান; ঢাকার আউটলেটে মোগল-স্থাপত্যের অবভাস – আর সিলেট আউটলেটে ঐতিহাসিক ক্বিন ব্রিজের সিলিংভাবনা। প্রতিটি স্থাপনায় স্থানিক-ঐতিহ্যের একটি বিশেষ মোটিফকে থিম করেছে শাহীনুর। বাতিঘর একাধিক বিষয়ানুষঙ্গকে ধারণ করে বাঙময় হতে পেরেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, ২০১৭ ও ২০১৯-এর একুশের বই মেলাতেও শাহীনুরের স্থাপত্য 'বাতিঘর' সেরা স্থাপনার স্বীকৃতি পেয়েছে।

এবার একটু ব্যক্তিবাচক হওয়া যাক। সুনামের উটকো চাপেও শাহীনুর আয় করে অনেক, ব্যয় করে অকাতর। এর মধ্যেই সামাজিক সংযুক্তি, নানা সাংগঠনিক সংযুক্তি, নানা ব্যক্তি সংযুক্তির দায়ও অকাতরে পালন করে। সেগুলোর আর্থিক হিসাব তুলে ওর আদর্শ-ঔদার্যকে খাটো না করি। কিন্তু এটুকু উল্লেখ করি, শাহীনুর নানাজন, নানা ব্যক্তিসংগঠনের কাছে বিল বা সম্মানী হিসেবে যত অর্থ পায়, যার বেশিরভাগই তামাদি হয়ে গেছে – সেটা দিয়ে আলিশান,

বিলাসবহুল একটা ফ্যামিলি-ডিজাইন করা যায়। পারিবারিক জীবনে দুই সন্তানের পিতা শাহীনুর সহধর্মী চিত্রশিল্পী পল্লবীকে নিয়ে আলিশান-বিলাসি ফ্যামিলি-আর্ট ডিজাইন করেনি।

বন্ধুপ্রাণ শাহীন, আর্টিস্ট শাহীন, ডিজাইনার শাহীন, মরমি-মিস্টিক শাহীন, দ্বৈতাদ্বৈত শাহীন, ভ্রমণ-পিপাসু শাহীন, সাংগঠনিক শাহীন, প্রতিষ্ঠানবিরোধী শাহীন – এ সব পরিচয়ের মধ্যে নাটকের সেট ডিজাইনার শাহীন বুঝি চাপা খেতে বসে! শাহীনের এ-পরিচয়টাকে এ-পর্যায়ে নামিয়ে আনা হলো নাটক আমার ব্যক্তিগত আগ্রহের জায়গা বলে। থিয়েটার আর্ট ইউনিট প্রযোজনা 'মর্ষকাম' [২০১৭]-এর মতো বড়ো নাটকের বড়ো সেট যেমন শাহীন বানিয়েছে, তেমনি 'শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্টস' [থিয়েটারওয়ালা রেপাটরি-২০১০], 'অনুদ্ধারণীয়' [থিয়েটার আর্ট ইউনিট-২০১৯] নাটকের পরিমিত, মায়াবী, 'মিস্টি' সেটও বানিয়েছে শাহীন, যেখানে সেট নিজেই স্থির-গতিময় এক দৃশ্যবাস্তবতা তৈরি করে মূলগল্পের প্যারালাল হয়ে ওঠে। তবে, থিয়েটার আর্ট ইউনিটের নন্দিত প্রযোজনা 'আমিনা সুন্দরী'র [২০০৭ ] সেট-ডিজাইনার শাহীনুর অনন্য।

আরাকান, রোসাঙ্গ, আলাওল, পদ্মাবতী, কোরেশি মাগন ঠাকুর – আরকান-বার্মা একদিন সনাতন-সুফি সংস্কৃতিতে বিকশিত হয়েছিল। বাংলার সাথে তাই বার্মার জীবন যোগাযোগ অনেক পুরোনো। বাঙলার দখিন-পুবের মানুষদের সাথে আরাকান-বার্মার চমৎকার সম্পর্কটি ভেঙে পড়ে পর্তুগিজ-জলদস্যু আর দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্ষমতাবিস্তারী মগদের তাণ্ডবে। তবে, বাঙলার সাথে আরাকান-বার্মার যোগাযোগটা ছিল নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক। দখিন-পুবের মাঝি-সওদাগরেরা সম্পর্কপতনের আগ পর্যন্ত বার্মা পাড়ি দিতো দীর্ঘ পরবাসের মতো। বার্মাপ্রবাসী এমনই এক ভাগ্যাহত স্বামী ও তার দেশে-রেখে-যাওয়া ভাগ্যবিড়ম্বিতা স্ত্রীর জীবন-সংগ্রামের ওপর লেখা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক-আখ্যান নিয়ে এস এম সোলায়মানের ধ্রুপদী রচনা 'আমিনা সুন্দরী' [২০০৭]। নাটকে বর্ণনাত্মক ন্যারেটিভের সাথে চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকপ্রিয়, লোকগান মিশে একটা চমৎকার দ্বৈত তৈরি করেছিল। কিন্তু এ-দ্বৈত, অভেদ হয়ে উঠতে পেরেছিল শাহীনের সেট-ভাবনায়। শাহীন চট্টগ্রাম-নোয়াখালি অঞ্চলের জনপ্রিয় নৌকা একটা 'সাম্পান'কে পাঁচ টুকরো করে এমন একটা সেট করেছে, যেখানে সাম্পানটি নানাদৃশ্যের বাস্তবতায় নানারূপ নিচ্ছে অবিরাম। এমনকি নাটকীয় অ্যাকশনের
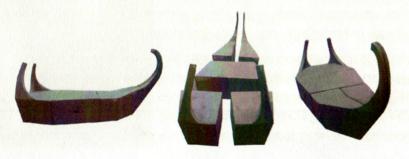
ভিতরে, নাটকীয় ঘটনাকে কোনোরূপ ঝাঁকি না দিয়ে, চলচ্চিত্রের ডিজল্‌ভ্ ট্রান্‌জিশনের মতো। থিয়েটার আর্ট ইউনিট-এর অন্যতম সফল বা দর্শকনন্দিত প্রযোজনা 'আমিনা সুন্দরী', একটা সুসমন্বিত কমপ্লিট থিয়েটার হয়ে উঠতে পেরেছিল সহজে ও অবিরাম নবায়নযোগ্য মঞ্চ-যোজনায়। নাটকীয় আখ্যানের মূল ন্যারেটিভের সাথে, সঙ্গীতের মতো, এ-নাটকের সেট 'সাম্পান'টিও তাই শক্তিশালী স্বতন্ত্র ন্যারেটিভ। যে-ন্যারেটিভ একের ভিতর বহু, বহুর ভিতরে একেকে গড়ে-ভেঙে দেখায় অবিরাম। দ্বৈতাদ্বৈত!

তবু বাকি থেকে যায়। প্রকাশক শাহীন বাদ পড়ে গেছে। বলেছিলাম একটা প্রতিষ্ঠানবিরোধী চেতনা শাহীন অর্জন করেছে চট্টগ্রাম পর্বেই। চট্টগ্রাম কালেই শাহীন চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বাইরের নানা ছোটোকাগজ-চক্রে যুক্ত হয়। আড্ডারু, দ্রষ্টব্য, প্রতিশিল্প, বিবর, জীবনানন্দ, পুষ্পকরথসহ অসংখ্য ছোটকাগজকে কেন্দ্র করে শাহীনুর সমকালীন তরুণ লেখকদের বৃত্তবলয়ে আসে। এ-সময়েই 'চোরাগোপ্তা ডুবো পাহাড়'-এর কবি হাফিজ রশীদ খান, 'সাপলুডো খেলা'র গল্পকার সেলিম মোর্শেদ, 'জটিলের জটিলতাজনিত জটিলতা'র গল্পকার রোকন রহমান, 'কাঁচের চুড়ি বালির পাহাড়'-এর কবি অলকা নন্দিতা, 'হরিণা ও সোনার তরী সকাল'-এর কথাকার রাজীব নূর, 'ছেলেদের-মেয়েদের স্নানের শব্দ'-র কবি জাফর আহমদ রাশেদসহ চিত্রশিল্পী নজরুল ইসলাম বাবুল, মোবাশ্বির আলম মজুমদার; অন্দর-সজ্জাকার মিজানুর রহমান লিটন, অনিন্দ্য সম্পাদক হাবিব ওয়াহিদ শিবলীসহ চট্টগ্রামকেন্দ্রিক প্রথাবিরোধী তরুণ চেতনাবলয়ের একজন হয়ে যায়। এ-সংযোগ-বলয়ের বিরোধী-চেতনার বীজ থেকে শাহীনুরের জ্যা পাবলিকেশন্স। এখান থেকে প্রকাশক শাহীনুর রহমান চিন্তা ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে বিরোধী-বিপ্লবী রচনাকে প্রকাশে উদ্যোগী – খুব ধীরে-সুস্থে। এ-প্রকাশনী থেকে এমন সিস্টেমেটিক বইও আবার প্রকাশ হতে দেখি – 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র' – মনিরুল ইসলাম।

এ-ডিজিটাল একাকিত্বের দিনে; ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দিনে; ভিতরে-বাইরে, সামনে-পিছে দুরকমের দিনে; সামাজিক মাধ্যমে ব্লক আর পিঠ চুলকানোর দিনে; দশস্বার্থে দশকাণ্ড, দশভাগে দশখণ্ডর দিনে; কোলাহলের সমুদ্রে নীরবতার দিনে; আপনা ঢোল আপনা বাজাও-এর দিনে; কঞ্জুমার-কমোডিটির দিনে; আই শপ সো আই এম-এর দিনে; ক্রেতা আর বিক্রেতার দিনে; নিউলিবারাল স্বপ্নের দিনে – প্রকৃত বন্ধু পাওয়া নাস্তিকের কাছেও ভাগ্যের মতো। ছলবন্ধু-দলবন্ধু, লেনাবন্ধু-দেনাবন্ধু, ছদ্মবন্ধু-অর্ধবন্ধুর বাজারে প্রকৃত বন্ধুবস্তু জোটানো অতীব দুরূহ! এই আকালে, শাহীনের মতো একজন 'বন্ধু' শতবন্ধু না থাকার অনটন, একাই ঘুচিয়ে দেয়। শাহীন বেঁচে থাকুক, এইভাবে, বন্ধু ভালোবেসে, বহুমুখী, কর্মময়, দীর্ঘমুখর জীবন।

পুনশ্চ: কোনো এক অবসরে, কোনো এক লেখায় কবি শাহীনুরকে বর্ণনার দায় রয়ে গেলো।

*সেলিম মোজাহার- লেখক, গবেষক, সংগঠক ও শিক্ষক*

## অবিকল আমারই সম্পূরক

রাজীব নূর

'লোডশেডিংয়ে মোম জ্বেলে ধরে লক্ষ করি, সে অবিকল আমারই সম্পূরক।' বাক্যটা উদ্ধৃতিচিহ্নে রাখার কারণ, এটি আমার লেখা নয়। কার লেখা তা মনে নেই। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের হবে হয়তো। অবশ্য অন্য কারো হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। সে যারই হোক, আমি যে কবিতার লাইনটা হুবহু মনে রাখতে পারিনি, এটা নিশ্চিত।

কবে কোনকালে পড়া কবিতার লাইনটি মনে এল এই সেদিন আমার বন্ধু শাহীনুর রহমানের জন্মদিনে। কবি সম্পূরক শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করেছিলেন কে জানে? এর আভিধানিক অর্থ একে অপরের পরিপূরকজাতীয় কিছু। শাহীন আর আমি, আমরা আসলে কেউ কারো পরিপূরক নই। বহুকাল আগে আমার কাছে শাহীনকে মনে হয়েছিল, সে অবিকল আমার সম্পূরক। ওর কাছে আমি কী সে প্রশ্ন করা হয়নি কখনো। করবার দরকারও নেই বোধহয়, বরং তিন দশক ধরে একসঙ্গে পথ চলার পর প্রশ্নটা অবান্তরই হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বছর দেড়েক পর আমাদের পরিচয় হয়। আশির দশকের শেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই আমরা। শাহীন চারুকলায়। আমি বাংলায়। ও এসেছে খুলনা থেকে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছেলে। তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আক্ষরিক অর্থেই ইসলামী ছাত্র শিবিরের দখলে। অবরুদ্ধ ওই ক্যাম্পাসে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করা এক দুরূহ কাজ। তবে শিল্পসাহিত্য চর্চা করব বলে পরিকল্পনা করে ক্যাম্পাস ছাড়িনি আমরা। ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম বলেই ছেড়েছি। আমাকে ক্যাম্পাস ছাড়তে হয়েছিল আত্মরক্ষার্থে। অসময়ে আমার ঘুমভাঙানোর চেষ্টারত শিবিরের এক সাথীকে ঘুষি মেরেছিলাম। মোটেই ভাবার অবকাশ নেই যে, জেনেশুনে বীরত্বপূর্ণ এই কাজটি করেছিলাম এবং এতকাল পরে অক্ষত অবস্থায় ওই স্মৃতিচারণ করছি। কাণ্ডটি আমি করেছিলাম ঘুমেরঘোরে। ফলে ভর্তি হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে আমাকে হল ছাড়তে হলো। ঘুমে আমি কেমন বেচইন সেটা বুঝিয়েশুনিয়ে দাদা (যে দাদাটি আমাকে তার সিট শেয়ার করতে দিয়েছিলেন) মারমুখী কতিপয় শিবিরকর্মীর হাত থেকে সেদিন আমাকে রক্ষা করেছিলেন। শাহীন ছেড়েছে এমন ভয়াবহ সংকটে পড়ার আগেই, বিবেকের তাড়নায়। চোখের সামনে শিবিরের নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে।

ভর্তির পর হলে থাকা নিয়ে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তা আমরা পরিচয়ের প্রথম দিনেই পরস্পরের সঙ্গে গল্প করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। প্রথম দেখাটি কোথায় হয়েছিল, তা ঠিকঠাক মনে করতে পারছি না। শাহীন হয়তো বলতে পারবে। শাহীন না পারলেও জাফর যে পারবে এটা নিশ্চিত। কবি জাফর আহমদ রাশেদ। বাংলা বিভাগে জাফর আর আমি ছিলাম



সহপাঠী। পরবর্তীকালে প্রথম আলোর সাহিত্য সম্পাদক এবং বর্তমানে প্রথমা প্রকাশনের প্রধান সমন্বয়ক জাফর চট্টগ্রামের ছেলে। ওর গ্রামের বাড়ি পটিয়ায়। জাফর ওর পটিয়া এলাকার বন্ধু নজরুল ইসলাম বাবুলসহ চট্টগ্রাম শহরে বাসা নিয়ে থাকতে শুরু করেছে প্রথম থেকেই। ওদের ওই বাসার সামনে শাহীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। জাফর ও বাবুলের ওই বাসাটি চট্টগ্রাম শহরের ব্যাটারি গলি অথবা বহদ্দারহাটে ছিল। তখন আমি প্রায় শহরতলী হালিশহরে থাকি। শাহীন আরো দূরে ফতেহাবাদে। তবে ফতেহাবাদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক কাছে।

বাবুল চারুকলার ছাত্র। শাহীন এসেছিল বাবুলকে খুঁজতে। আমি জাফরকে। ওরা কেউ বাসায় ছিল না। শাহীন ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন মুঠোফোন বলে বস্তুটির আবির্ভাব ঘটেনি। তাই কে কোথায় আছে চটজলদি জানার উপায় ছিল না। আমি জাফরকে খুঁজতে গিয়ে শাহীনকে পেলাম। প্রথম দেখা হলেও আমরা দুজনই দুজনের কথা জানতাম। কাজেই প্রথম দেখাতেই আমরা তুই সম্বোধনে চলে এলাম। অপেক্ষার অবসরে গল্প হচ্ছিল। শাহীন বলেছিল, ও যে রুমে উঠেছিল, তার পাশের রুমে শিবিরের ছেলেপেলেরা কোনো একজনকে ধরে এনে নির্যাতন করছিল। নির্যাতিতের জন্য কিছু করার ক্ষমতা ছিল না ওর। ও একা নয়, আমাদের সবাইকে একবার না একবার এই রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে, কাউকে নির্যাতিত হতে দেখে চুপটি করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। জানতাম প্রতিবাদ করতে গেলে দ্বিগুণ নির্যাতনের শিকার হওয়া লাগবে। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে. তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে', অন্যায় সইতে পারছিল না বলে সেদিন নিজের ট্রাঙ্ক এবং বিছানাপত্র

গুটিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল শাহীন। কোথায় থাকবে কিচ্ছু জানা ছিল না ওর।

প্রথম দেখাতেই শাহীন বলেছিল সে শহরে চলে আসতে চায়। চলেও এল কিছুদিনের মধ্যেই। ও শহরে আসার অন্তত বছরখানেক পর আমরা একসঙ্গে থাকতে শুরু করলাম। টানা সাত বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার আর্থিক অনটন ছিল সীমাহীন। আমরা দুজনই আয়-রোজগারের জন্য নানান কিছু করেছি। আমার তুলনায় ওর আয় এবং পারিবারিক সমর্থন অনেক বেশি ছিল। তবে আমার জন্য ওর ছিল অকুণ্ঠ সহযোগিতা। আমি ওকে কিছুই দিতে পারিনি। ওর কাছ থেকে নিয়েছি অনেক।

প্রথমে আমরা ছিলাম নাসিরাবাদ এলাকায়। চট্টগ্রামের বিখ্যাত 'পূর্বকোণ' পত্রিকা অফিস-লাগোয়া একটা বাড়িতে। ওই বাড়ির ছেলে জসীমও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চট্টগ্রামে বাড়িওয়ালাদের জমিদার বলে ডাকা হয়। জমিদার জসীমদের বাড়ি ছেড়ে আমরা যাই নাসিরাবাদেরই আরেকটুখানি ভেতরের দিকে মহিলা কলেজের সামনের একটি বাড়িতে। জাকির হোসেন রোডের ওই বাড়িতেই জন্ম হয় আমাদের পত্রিকা 'আড্ডারু'র। কালের বিবেচনায় 'আড্ডারু' নামে ওই ম্যাগাজিনটির হয়তো খুব গুরুত্ব নেই, তবে আমাদের তৈরিতে এর রয়েছে সীমাহীন অবদান।

'আড্ডারু' যখন বের হয়, ততদিনে চট্টগ্রাম শহরে আমাদের যথেষ্ট চেনা-পরিচিত হয়ে গেছে। আমরা নিয়মিত যাই সবুজ হোটেলের আড্ডায়। 'লিরিক' সম্পাদক এজাজ ইউসুফীর স্নেহধন্য হয়ে গেছি। হাফিজ রশিদ খানের 'পুষ্পকরথ'ও সবুজ আড্ডার আরেকটি প্রকাশনা, যে পত্রিকাটির নামলিপি শাহীনের করা এবং প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল আমার গল্প দ্রৌপদী ও তার প্রেমিকেরা। আবুল মোমেন, শিশির দত্ত, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, ওমর কায়সার সবাই তখন 'পূর্বকোণ' পত্রিকায় কাজ করতেন। পত্রিকাটিতে আমাদের গল্প-কবিতা নিয়মিত ছাপা হতো। তবু আমরা নিজেরা একটা সাহিত্যের আড্ডা শুরু করি। আমাদের আড্ডায় সীমা আপা, মানে শামীম আরা নিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

জাকির হোসেন রোডের ওই বাড়িটা ছিল অনেকগুলো টিনসেডের সমন্বয়। ওই টিনসেডগুলোর একটা ঘরে থাকতেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়কার নবীন শিক্ষক হোসাইন কবির। তার ঘরেও আমাদের আড্ডা বসতে শুরু করে। আড্ডায় প্রায় নিয়মিত আসতেন হাফিজ রশিদ খান। ওই আড্ডা থেকে একটা প্রকাশনা করার সিদ্ধান্ত হলে নামকরণের প্রসঙ্গ আসে। হাফিজ রশিদ খান বললেন, 'নাম রাখা যায় আড্ডারু।'

অপ্রচলিত শব্দে শাহীনের মোহ আছে। তাই হাফিজের দেওয়া নামের সমর্থনে সে একাট্টা। যুক্তিটা দারুণ, সাঁতার কাটে যে সে যদি সাঁতারু হয়, তবে আড্ডা যে দেয় সে কেন আড্ডারু হবে না। অনেক আড্ডা হয়েছে তখন আমাদের। নেশাভাঙও নেহায়েত কম করা হয়নি। 'আড্ডারু'র আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আমরা একটি কবিতা উৎসবের আয়োজন করেছিলাম,



ছোট্ট একটি সংকলনও প্রকাশ করা হয়েছিল। উৎসবটি হয়েছিল, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। আমাদের উৎসবে অনেক সাড়া পড়েছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের বেশ আগে আমরা অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে, এই খবরে সাম্প্রদায়িক সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। সেই রাতে আমরা আমাদের হিন্দু বন্ধুদের, বিশেষ করে হিন্দু মেয়েবন্ধুদের যার যার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। পরে বাসায় ফিরে একের পর এক গুজব শুনতে শুরু করলাম। নিউমার্কেটের মোড়ে একজন হিন্দুকে কারা মেরে ফেলে রেখে গেছে। হাজারী লেন আক্রান্ত হয়েছে। পরেরদিন সকালবেলায় নিশ্চিত হয়েছি নিউমার্কেট এলাকায় কেউ খুন হয়নি। হাজারী লেন পর্যন্ত রাতেরবেলাতেই গিয়েছিলাম এবং দেখেছি হিন্দু অধ্যুষিত ওই পাড়াটিকে দুদিক থেকে অবরোধ করে রেখেছে কথিত ধর্মপ্রাণরা। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ছিল বহুকাল ধরে, তবে ১৯৯২ সালে এটি আবার সহিংস রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেই থেকে একতরফা মার খেয়ে যাচ্ছে সংখ্যালঘুরা। ৬ ডিসেম্বরের ওই রাতে চট্টগ্রাম শহরের এপথে-ওপথে অনেক ঘুরেছি আমরা। নিশ্চয়ই দেশ যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে সে নিয়েও কথা বলেছি। আমার মনে আছে, আমি আমার গ্রাম উজাড় করে হিন্দুদের দেশত্যাগ করার গল্প বন্ধুদের বলছিলাম।

রাতেরবেলা ঘুরে বেড়ানোয় বোধহয় শাহীনের আগ্রহ ছিল বেশি। বেশিরভাগ রাতেই খাতা-কলম নিয়ে বেরিয়ে যেত সে। ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষ হতো ওর ড্রইং চর্চার বিষয়। একরাতে রেলপুলিশ শাহীন আর মোবাশ্বির মানে শিল্পী ও শিল্পসমালোচক মোবাশ্বির আলম

মজুমদারকে সারারাত আটকে রেখেছিল রেলস্টেশনে ছবি আঁকার অভিযোগে। সকাল না হতেই স্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হওয়ার আগেই পুলিশ ওদের দুজনকে ছেড়ে দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার শাটল ট্রেনটা এই স্টেশন থেকে যাত্রারম্ভ করত।

আমাদের রাতের ঘোরাঘুরি এবং পুলিশের সঙ্গে ইঁদুর-বেড়াল খেলার গল্প অনেক। চট্টগ্রাম শহরজুড়ে আড্ডা দিয়েছি আমরা। ঈদগাহ এলাকায় রোকন রহমানের আড্ডা ছিল শাহীনের প্রিয় একটি জায়গা। আমিও গিয়েছি বারবার। রাত-বিরেতে আড্ডা শেষে রোকনের বাসায় থেকেও গিয়েছি মাঝেমধ্যে। ওই আড্ডায় আমাদের নিয়ে যাওয়ায় বিপু, মানে সত্যজিৎ পোদ্দার হয়েছিল অনুঘটক। বিবিএ পড়ুয়া বিপু কোন মন্ত্রণায় আমাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল সে 'ও নিজেই ভালো বলতে পারবে। যতদূর মনে হয় রোকনের ওই আড্ডাসূত্রেই শাহীন চট্টগ্রামের বাইরের অনেক লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত হয়। বগুড়ার 'দ্রষ্টব্য', বরিশালের 'জীবনানন্দ' সবসময়ই ওর আঁকা প্রচ্ছদে শোভিত হয়েছে। 'দ্রষ্টব্য' রীতিমতন ক্রোড়পত্র করেছে ওর আঁকা, লেখা এবং সাক্ষাৎকার নিয়ে। এরই মধ্যে চট্টগ্রামে হলো শাহীনের একক চিত্র প্রদর্শনী 'যাপনযজ্ঞে স্বকৃত উত্থান'। প্রদর্শনীটা অনেক প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু ছবি বিক্রি হয়নি একটিও। কারণটা সহজ। শাহীনের ছবি বৈঠকঘরে টানিয়ে রাখার মতো কমনীয় নয়। শাহীন আর পল্লবীর একটি দ্বৈত প্রদর্শনী হয়েছিল আমার শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

শাহীন আগের মতো ছবি আঁকে না। ছবি আঁকে না বলা ঠিক হবে না। ছবি বলতে আমাদের মনে যে ধ্রুপদী ধারণাটি তৈরি হয়েছে, তা হলো বড় ক্যানভাসে তেলরঙে আঁকা ছবি, যা শাহীন ওই দুটি প্রদর্শনীর পর খুব একটা করেনি। হালে সে স্থাপনাশিল্পে মনোযোগী হয়েছে এবং এ

জন্য জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে। ওর করা নাটকের সেট ডিজাইন বহুল প্রশংসিত হয়েছে, হচ্ছে। বইয়ের দোকান 'বাতিঘর'-এর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে করা আউটলেট তিনটির স্থাপত্যসৌকর্য মুগ্ধ করে চলেছে মানুষকে।

খুব প্রস্তুতি নিয়ে শাহীন কাজ করে না। এমনকি ছবি আঁকাটাও। নব্বইয়ের দশকে পরিচয়ের পর থেকে শাহীনকে আঁকার খাতা ছাড়া খুব কম দেখেছি আমি। গল্প করতে করতে আঁকার যে অনায়াসদক্ষতা, তা আমাকে সর্বদাই মুগ্ধ করেছে। গল্প আসলে শাহীন করে না। অন্যের গল্প শুনে। বিশেষ করে আমরা যখন ছোটবেলার গল্পে মশগুল হয়ে যেতাম, 'ও নীরবে শুনে যেত। ছোটবেলায় অনেক ঘরকুনো ছিল সে। শৈশব কেটেছে খুলনার খালিশপুরে পেপার মিলের কলোনিতে। এক কলোনিতে গোটা বিশ্ব দেখার অভিজ্ঞতা যার, তাকে তো ঘর থেকে বেশি দূরে যেতে হয়নি। ওই খুলনাকেই শাহীন নিজের বাড়ি বলে জানে।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ এলাকার যে বাড়িতে ১৯৬৯ সালে শাহীনের জন্ম। মাস্টার্স পরীক্ষার পর একবার ঢাকায় আসার পথে কী কারণে যেন ফেনীতে বাস থেকে নেমে যেতে হয়েছিল আমাদের। তখন 'ও আমাকে বেগমগঞ্জে যাওয়ার প্রস্তাব করে। আমি বিস্মিত হই, এর আগের ছয়-সাত বছরে কখনোই বলেনি যে ওর বাপ-দাদার বাড়ি এত কাছে। অন্য যে কারোর বেলায় হলে আমি ভাবতাম হয়তো নিজের 'নোয়াখাইল্যা' পরিচয় গোপন করতে চেয়েছে। শাহীনের বেলায় আমি তা ভাবিনি। কারণ আমি জানি, আত্মম্ভরিতা যেমন নেই, তেমনি হীনম্মন্যতায়ও কখনো ভোগে না সে। তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও ওর কাছে গুরুত্বহীন মনে হতে পারে। প্রত্যাশিত কিছু পেতে গিয়ে অপমান বোধ করলে অনায়াসে পথে ফেলে দিয়ে আসতে পারে। শাহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চেয়েছিল। হলে হয়তো শিল্পচর্চা অনেক সহজ হতো। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেটগুলোও সংগ্রহ করেনি।

শাহীনদের মাস্টার্স পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল সবার আগে। সেশনজটে আটকা পড়ে আমরা রয়ে গেলাম ক্যাম্পাসে। এই ফাঁকে শাহীন আর আমাদের আরেক বন্ধু মিজানুর রহমান লিটন মিলে ঢাকায় ডিঙ্গা নামে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করল। শুরুর কয়েক মাস লিটনের ব্যাগে এবং শাহীনের মাথায় ছিল ডিঙ্গা। প্রচ্ছদ করার অভিজ্ঞতা তো শাহীনের ছিলই। লিটন বাংলাবাজার ঘুরে ঘুরে গাইড বইয়ের প্রচ্ছদ করার কাজ সংগ্রহ করে আনছিল। এটা শাহীনের ছিল অন্তবর্তীকালীন কিছু একটার সঙ্গে যুক্ত থাকার পরিকল্পনা। পরীক্ষা শেষে আমরা আরো কেউ কেউ ঢাকায় এসে জুটলাম। এর মধ্য শাহীনদের রেজাল্ট হলো। রেজাল্টে সে ভীষণ হতাশ। তবে এসএসসি থেকে অনার্স পর্যন্ত সব কয়টা প্রথম বিভাগ পাওয়া একজন ছাত্র মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার পরও চেষ্টা করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারত। আমি অনেকবার বলেছি, তুই ট্রাই কর। সে কোনো চেষ্টাই করেনি। বরং খুব স্পষ্ট করেই আমাকে বলেছে, আমি অমুক আলী, তমুক বানুর সহকর্মী হতে যাব না।

ভালো কথা, শাহীনের সঙ্গে বেগমগঞ্জ ঘুরে আসার পর থেকে আমি কিন্তু 'নোয়াখাইল্যাদের' অনেক ভালোবাসি।

*রাজীব নূর- লেখক ও সাংবাদিক*

## শাহীনুরের স্বদেশচেতনাধৃত কনসেপ্ট আমাকে কেবল মুগ্ধই করে

হেনরী স্বপন

বন্ধু শাহীনুর রহমানের পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। সবাই যে বলে, চল্লিশ পেরুলেই চালশে হয়। তাহলে, পঞ্চাশ পেরোনো মানেই তুমুল আলসে জীবন। এবং সেই আলসেমি তো এরই মধ্যে আমাকে পেয়ে বসেছে আরও কয়েক বছর আগেই। সে কারণেই হয়তো, আত্মার আত্মীয় আমার আরেক বন্ধু গল্পকার (এখন সে তুখোড় সাংবাদিক) রাজীব নূরের বারবার তাগাদা সত্ত্বেও সময় মতো শাহীনুরকে নিয়ে আমার লেখা বন্ধুভজনা শেষ করতে পারলাম না। এ জন্য বন্ধু নূরের আদুরে ভর্ৎসনাও শুনতে হলো। আবার টাইম লাইন বেধে দেওয়া সময়েই লেখাটা দিতে হবে, এমন ধমক আবদারও শুনতে হলো।

নব্বই দশকে আমার লেখালেখির আবির্ভাবকালে হঠাৎই চট্টগ্রামের কয়েক লেখকবন্ধুর সাথে ঢাকায় 'পাঠক সমাবেশ'-এর বিজু'র মাধ্যমে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল শাহবাগে। সেদিনের সেই বন্ধুরা ছিল তখনকার অনন্য লিটলম্যাগ 'লিরিক' গ্রুপের কবি সোহেল রাব্বি, কবি জিল্লুর রহমান, কবি এজাজ ইউসুফী আর কবি পুলক পাল। বলা যায় এদের সাঁকো পেরিয়েই পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে পরিচয় ঘটে তখন চট্টগ্রামে অবস্থানরত কবি জাফর আহমদ রাশেদ, কবি অলকা নন্দিতা, গল্পকার রাজীব নূর এবং শিল্পী শাহীনুর রহমানের সাথে। পর্যায়ক্রমে এর পরিধি ক্রমশই বেড়েছে। সেই রোমন্থন এই লেখায় আর নাই-বা বাড়ালাম। শিল্পী শাহীনুর তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্র। শিল্পচর্চার প্রারম্ভিককালেই তার রেখানির্ভর ড্রয়িং আমাকে মুগ্ধ করত। কেননা, ওর রেখার অপূর্ব দক্ষতায় আমি বরাবরই রেসের অশ্বের দুরন্ত ছুটে চলা কাগজের আঁকা প্রতিটি ঘোড়াকে স্পেস গ্রাউন্ড থেকে উঠে আসা লালদীঘির ময়দানে জীবন্ত ছুটে বেড়াতে দেখেছি। কখনো আবার রেখায় ও রঙের ফিগারেটিভে কিংবা কখনো ওর ড্রয়িংয়ের আঁচড়ে নারীকেন্দ্রিক নানা ভঙ্গিমার ধ্রুপদী অনুভব ও সম্প্রতিক সংঘাত উভয়ই দেখেছি মিলেমিশে একাকার। কখনো দেখেছি, পিকাসো-দালির ন্যুড ইংগিতময়তায় কোনো এক পাহাড়ি মেয়ের কোমল রূপ... কালি ও কলমের রেখায় ও জলরঙের প্রলেপনে ক্যানভাসে ছবির দৃশ্যায়নগুলোর প্রকাশ ঘটেছে অপূর্ব দক্ষতায়। হয়তো কিউবিজম, ফিউচারিজম, হয়তো মেটাফিজিক্যাল পেইন্টিংয়ের সৃজনশীলতাই ওর আঁকায় এমন মনোগ্রাহী বৈচিত্রময়তা ছিল বলেই হয়তো, সুররিয়ালিস্টিক আবহে বরাবরই সেইসব ড্রয়িংয়ের প্রাধান্য আমাদেরকে মুগ্ধ করে আজও।

বিশেষত, প্যারিস থেকে আঠারো ও উনিশ শতকের যে বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন শিল্প আন্দোলনের শুরু হয়েছিল, তা ছিল অতিমাত্রায় যুক্তিনির্ভর। যদিও সেখানেও তীব্রভাবে অবহেলিত হয়েছে মানুষের ভেতরের অবচেতন সত্তা। তাই, মানুষের মন, চিন্তা, ভাষা এবং অভিজ্ঞতাকে যুক্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করাকেই পরম বাস্তবতা বা সুপার রিয়ালিটি ভাবা যেত। সেই ভাবনা
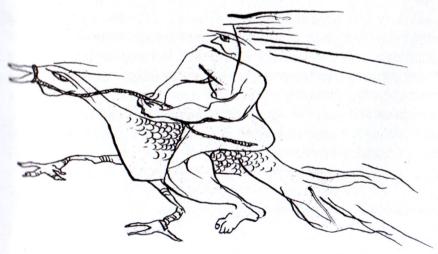
থেকেই হয়তো শুরু হয়েছিল সিগমুন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্নের উৎপত্তি নিয়ে ভাবনার কথা। তখন ফ্রয়েড অবচেতন মনের যে ধারণার উত্থাপন করেছেন, তার থেকেই হয়তো খাঁটি মার্কসবাদীর মতো সামাজিক যৌক্তিক বেড়াজাল থেকে মনকে মুক্ত করার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে সুররিয়ালিজমের ধারা। আস্তে আস্তে যা সাহিত্য, চিত্রকলা, সিনেমা, গান, রাজনীতি, দর্শন এমনকি সমাজবিজ্ঞানেও এই আন্দোলনের মাত্রা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আর শিল্পকলায় তখনকার এই আন্দোলনের বিখ্যাত শিল্পী আন্দ্রে ব্রেতো, জোয়ান মিরো, সালভেদর দালি, ফ্রিদা কাহলো এরা তখন শিল্পকে নিয়ে গেছেন বিমূর্তের মধ্য দিয়ে ধ্রুপদীবোধের কনস্ট্রাক্টিভ অনন্য মাত্রায়। শিল্পের জন্য তৈরি করেছেন স্বতন্ত্র পৃথিবী। যেখানে মিলেমিশে একাকার বাস্তবতা আর শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা ছাপিয়ে উঠেছে সমসাময়িক যুগের সুররিয়ালিস্টিকে। যার শৈল্পিক আঁচড়েই রূপারোপিত হয়ে চলেছে আজকের এই অনন্য শিল্পের জগৎ।

বন্ধু শাহীনুরের শিল্পজগৎ ও তার শিল্পভাবনার নানা কাজেও আধুনিকতাবাদী শিল্পধারার যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তা মূলত সুররিয়ালিস্ট চেতনা থেকেই উৎসারিত হয়েছে। ফলে ওর ছবি আঁকায় স্বাভাবিকতাবাদী প্রাকরণিক দক্ষতা ও আমাদের বিপন্ন জগতের গভীর মানবিকতা উৎসারণেও নিজস্ব এক কল্পরূপাত্মক অনুষঙ্গ ফুটে ওঠে। যে কারণে, আজও শাহীনুরকে শিল্পের ক্ষেত্রে নানাভাবে উদ্ভাসিত শিল্পসত্তার রূপায়বে অন্যদের থেকে পৃথক করে চেনা যায়। এই যেমন বন্ধু-ছোটভাই দীপঙ্কর দাসের বইবিপ্লব বিতরণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান 'বাতিঘর'-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং সিলেটে 'বাতিঘর' প্রতিষ্ঠানকে শাহীনুর যেভাবে প্রত্ন-স্থাপত্যের জ্যামিতিক ধারায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিজস্ব কনসেপচুয়াল ধারণা ফুটিয়ে তুলেছে। এটা সত্যি যে, একটি গ্লোবাল ব্যবসায়িক ধারণার ক্ষেত্রেও শাহীনুরের এই স্বদেশচেতনাধৃত কনসেপ্ট যেন আমাদের কেবল মুগ্ধই করে না, অনুপ্রাণিতও করে নান্দনিক অনুভবের অসামান্য সৌন্দর্যকে ভালোবাসতেও শেখায়।

পুনশ্চ:
১৯৯৪ সালে যখন আমার প্রথম একফর্মার কাব্যপুস্তিকা কীর্তনখোলা প্রকাশিত হয়, বন্ধু শাহীনুর আমার সেই বইয়ের জন্য দুইপাতা ইলাস্ট্রেশন স্কেচ দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছিল। ১৯৯৫ সালে যখন আমি পূর্ণাঙ্গভাবে কবিতার কাগজ জীবনানন্দ সম্পাদনা ও প্রকাশের উদ্যোগ নেই। সেই কাগজের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ করেছিল শাহীনুর। আমারতো মনে হয়, এ যাবৎকাল প্রকাশিত জীবনানন্দ'র প্রথম প্রচ্ছদটিই এখনো আমার কাছে এক অনবদ্য কাজ বলে মনে হয়। সার্বিকভাবে বলা যায় ওর শিল্পের ভিত্তি যতোই অনাড়ম্বরের হোক না কেন, ওর হাতেই এদেশের বহু নান্দনিক লিটলম্যাগ বরাবরই শিল্পের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হয়েছে। এ জন্যেও শাহীনুরের শিল্পসত্তায় আমরা গর্বিত।

জয়তু বন্ধু শাহীনুর রহমান।

*হেনরী স্বপন- কবি ও লিটলম্যাগ সম্পাদক*



# আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা

## মোবাশ্বির আলম মজুমদার

আমরা যারা চল্লিশের চৌকাঠ পেরিয়ে
পঞ্চাশের দিকে
সেদিন আঠারো বছরের উথাল-পাথাল বাউণ্ডুলে সেজে
সারারাত তুমুল হৈ হল্লা।
আগুনের পিণ্ডি গিলে গিলে, আগুনের পিণ্ডি গিলে গিলে...
... আমাদের উড়ো চুলগুলো তখন মনুমেন্ট-মুখো মিছিলের পতাকা
আমাদের শরীরের খাঁজে খাঁজে তখন বিরজু মহারাজের কত্থক গলায় আমীর খাঁকে বসিয়ে কোরাস ধরেছি।
-জগতে আনন্দ যজ্ঞে
-আমাদের তুমুল হৈ হল্লা
-পূর্ণেন্দু পত্রী

শাটল ট্রেন, স্টেশনে স্টেশনে থেমে থাকা ট্রেনে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণদের চলাচল। এ যেন তারুণ্যের মহোৎসব। গত শতকের ১৯৮৯-১৯৯০ শিক্ষাবর্ষে শাহীনুর রহমানের সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) চারুকলা বিভাগে দেখা। ক্লাস শুরুর পর পর চবিতে যাতায়াত করার এক বিস্ময়কর ও আনন্দদায়ক ব্যবস্থা শাটল ট্রেন। কখনো কখনো ট্রেনের ছাদে চড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতে হতো। ট্রেনের ছাদে উঠে যাত্রা করার সাহস হয়নি কোনোকালেও।

তবুও এক দুপুরে বাধ্য হলাম ট্রেনের ছাদে করে শহরে ফিরতে। ভেতরে ভেতরে ভয় থাকলেও বাইরে দেখাচ্ছি তুমুল সাহস। ছাদে উঠেই দেখলাম কর্ণফুলী কাগজে তৈরি স্কেচ খাতা হাতে চশমা পরা বাবড়ি চুলের ছাঁটে আঁকায় মগ্ন শাহীন। বিষয়-'ফড়িংয়ের সঙ্গম'। একের পর এক কালো কলমের রেখা টেনে যাচ্ছিল। আমার ও অন্যান্য মুগ্ধ দর্শকের অনেক কিছু জানার থাকলেও জানা হয়নি। শাহীনুর রহমানের কাজের প্রতি মুগ্ধতা ঐ প্রথম। আমার মায়ের কাছ থেকে কুড়ি টাকা করে পেতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাত খরচা হিসেবে। কলাভবনের নিচতলায় (বেসমেন্টে) ক্যাফেটেরিয়ায় অন্যদের সাথে দুপুরের খাবার খেতে বসে শুধু ভাত কেনার টাকা শোধ করে বন্ধুদের বাটি থেকে তরকারি ভাগাভাগি করার মাধ্যমে বলা যায় অনেকটা ফাও খেয়ে উঠতাম। কৃচ্ছতাবশত চেষ্টা ছিল ২ টাকা দামের গোল্ডলিফ সিগারেট না কিনে কীভাবে ধূমপান সেরে নেয়া যায়। এসব কর্মের সঙ্গী করে নেবার চেষ্টা চললেও শাহীন সাড়া না দিয়ে নিজের স্কেচ

খাতায় মনোনিবেশ করে থাকতো। ফলে একটাই (কখনো নূর-ই আকবর, নূরীদা) সঙ্গী হতেন।

সকাল থেকে দুপুর অব্দি চারুকলা বিভাগের ক্লাশকার্যক্রম নিয়ম মেনেই চলতো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা শহরে ফিরে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মাঝে হুল্লোড় শুরু হয়ে যেত। মুক্ত স্বাধীন ঐ বিকেলে সময় উদ্‌যাপনের জন্যে আমরা সন্ধ্যা ৬টার ট্রেনে শহরে ফিরে আসতাম।

সবার সাথে শাহীনুরের যুক্ততা ছিল, বন্ধুত্বও ছিল। কোনো কোনো সময়ে শাহীন সবার মাঝে আলাদা হয়ে উঠতো। মনে হতো ধ্যানী অর্ন্তমুখী একজন মানুষ। সবার সাহচর্যে থেকেও কাজের প্রতি নিবিষ্ট, অনেক হুল্লোড়ে যুক্ত হয়ে এক মৌন-মগ্ন বন্ধু শাহীনকে দেখতে থাকি। মেটে হলুদ রঙ ফুল স্লিভ শার্ট আর আবছা নীল রঙের জিন্সে বহুদিন চলে যেতো। আমার গায়েও তখন আমার মামার কাছ থেকে ফেরৎ দেয়ার কথা বলে নেয়া শার্ট, যা পরে বাবুগিরি দেখাচ্ছি। পকেটে টাকা নেই তো কী হয়েছে দুজনে কারিগর বিড়ির কাছে ঋণী হয়ে আছি সেই কবে থেকে। বিড়ির ধোঁয়ায় কুণ্ডুলী পাকিয়ে পিকাসো হওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। শাহীনের সাথে দেখা হলে প্রথম যা হতো–কোনো বাক্য ব্যয় না করেই ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দেয়া। শুধু বিড়ি সিগারেট বিনিময় করে আর স্কেচ খাতায় মুখ গুঁজে সময় পার হতো। এ দীর্ঘ সময় কখনো আমরা বিরক্ত হই না। দীর্ঘ নীরবতা আমাকে আরও নিবিষ্ট করে তুলতো।

এভাবে সময় যেতে থাকে। পেইন্টিং বিভাগ থেকে স্নাতক করার পর শাহীন ছাপচিত্র বিভাগে এমএফএ শুরু করলো। ছাপচিত্র বিষয়ে শাহীন সাদাকালো স্কেচধর্মী কাজে সবাইকে ছাপিয়ে

এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৯২-র জাফলং ট্যুরে শাহীন আমাদের সঙ্গী হয়। আমাদের ২৪তম ব্যাচের সবার সাথে শাহীনও যুক্ত হয়। যেখানে যাই শাহীন সাথে থাকে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে একা থাকে। সেখানেও প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়ে স্কেচ খাতায় আঁকিবুকি করতে করতে সময় পার করে। ভ্রমণে কিংবা স্কেচে কোনো কিছুতেই উচ্ছ্বাস নেই। আছে শুধু নিবিষ্টতা। এক চিলতে হাসি হেসে ঠোঁটে গোল্ডলিফ গুঁজে দিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে যাওয়া।

শাহীনের কাছে কাজই প্রধান হয়েছিল। নিবিষ্ট, একক চিন্তার মাঝে ডুবে থাকা, দুরন্তপনার অভ্যন্তরীণ উদ্‌যাপন এক সময় আমাকে কাছে টানে।

রোজগারের চিন্তা থেকে গড়ে ওঠা 'সিম্ফনি এডভার্টাইজিং' গড়ে তোলা, বেশ কিছু সময় পর বিলুপ্ত হওয়া এসব ভালোমন্দের মধ্যমণি শাহীনই।

শিল্পপরিকল্পনায় সনাতন ধারার বিপরীতে গড়ে ওঠা শাহীন পর্যায়ক্রমে এক বিস্ময়কর সৃষ্টিশীলতা উপহার দিতে থাকেন আমাদের। অতীত স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে চুম্বক অংশ দিয়ে শাহীনের প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। শুধু টুকরো টুকরো গুরুত্ববহ শিল্পযাত্রার চিহ্নগুলো আলোচনা রেখেই আমার লেখার ইতি টানবো।

স্নাতক শেষ করার আগেই ক্লাসে মুর্তজা বশীর স্যার অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন আউটডোরে স্টাডি অথবা স্টেশন বা প্লাটফর্ম স্টাডি।

যথারীতি শাহীন ও আমি রাত সাড়ে এগারোটা কিংবা কিছু পর চট্টগ্রাম রেলওয়ের পুরাতন ভবনের প্লাটফর্মে শুয়ে থাকা আধাশোয়া মানুষের স্কেচ করছিলাম। কিছু সময় পর রেলওয়ে নিরাপত্তা কর্মীর দুজন সদস্য এসে আমাদের বললেন–'ভাই এখানে ছবি তুলছেন কেন'? আমি উত্তরে বললাম, আমরা ছবি তুলছি না, ছবি আঁকছি। নিরাপত্তারক্ষীগণ বললেন–'না এটা সংরক্ষিত এলাকা (যদিও অগণিত মানুষ এপার ওপার হাঁটাচলা পারাপার সবই হচ্ছে)। আপনারা ছবি তুলতে পারবেন না, থানায় চলেন। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। বলে কী! তারপর দুজনকে নিয়ে গেলো রেলওয়ে থানায়। সেখানে আমাদের একটা জায়গায় বসে থাকতে উপদেশ দিলেন। আমি আর শাহীন একজন আরেকজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলাম। আমি কর্মকর্তাকে বললাম, স্যার আমরা কি সিগারেট খেতে পারবো? তিনি বললেন না, আপনারা এখন অ্যারেস্ট, সিগারেট খেতে পারবেন না। এভাবে দুঃসহ রাত পার করার পর আমাদের ভোর পাঁচটায় ছেড়ে দেয়া হলো। এভাবে শিল্পচর্চায় কঠিন ও দুঃসময় পার হতে হতে আজ অর্ধশতক পাড়ি দিচ্ছি।

সেই কবে থেকে দুঃসময়কে পার করে দিয়ে আমরা সুদিনের প্রত্যাশায় পথ চেয়ে আছি। হয়তো সে সুদিন আসবে, উজ্জ্বল সকালের মতো ক্ষিপ্র গতির ঘোড়সওয়ার হয়ে। শাহীনের প্রাণের অভ্যন্তরে যে গতির স্ফুরণ সে আলো হয়ে উদ্ভাসিত থাকবে আমাদের অন্তরে।

*মোবাশ্বির আলম মজুমদার- চারুশিল্পী, শিল্পসমালোচক ও শিক্ষক*

# বন্ধু এসো স্বপ্ন আঁকি

জাহেদ আলী চৌধুরী যুবরাজ

বন্ধু এসো স্বপ্ন আঁকি
চারটা দেওয়াল জুড়ে।
বন্ধু এসো আকাশ দেখি,
পুরোটা চোখ খুলে।
বন্ধু এসো জলে ভাসি,
দুখ ভাসানোর সুখে।
বন্ধু তোমার বন্ধু আমি
বন্ধু মোরা কজন।

কৃষ্ণকলির গানটা শুনলেই কেমন জানি নস্টালজিক হয়ে পড়ি। যে দিনটির কথা দিয়ে শুরু করতে চেয়েছিলাম তার দিন, বার, তারিখ ঠিক মনে করতে পারছি না। কোন মাস, কোন ঋতু ছিল তাও আজ আর মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ছে আমরা সবাই ভ্যানগগের মতো একজন বড় মাপের শিল্পী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। 'কর্নফিল্ডস অ্যান্ড র‍্যাভেনস' ছবির পাখিদের সমাবেশের কথা মনে পড়ছে। গুরুগম্ভীর স্যার শিল্পী অলক রায় ক্লাস নিচ্ছেন। কথা বলবার সুযোগ তেমন নেই। সামনেই আছে মডেল। তাকে পর্যবেক্ষণ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুশীলন করছি আমরা।

বলছিলাম আমাদের কথা, যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা বিষয়ে ভর্তি হয়েছিলাম এবং শিল্পের সত্য অনুসন্ধানে যেনবা এক একটা পাখি হয়ে উড়তে শুরু করেছি।

পুরাতন কলাভবনের পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই আমাদের শ্রেণিকক্ষ। ক্লাস রুমের জানালা দিয়ে দূরে দেখা যেত জারুল তলা, ক্যাফেটেরিয়া আর ঝুপড়ি। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এই ক্লাস রুমেই আমাদের এক সঙ্গে থাকা–এ এক অন্য রকমের অভিজ্ঞতা। ফাঁকে ফোকরে একজন আরেকজনকে চিনতে শুরু করলাম।

একদিনের ঘটনা–চশমাধারী, কপাল পর্যন্ত লম্বা চুল, মাঝারী গড়নের শুদ্ধ বাংলায় কথা বলা ছেলেটি আমার ঠিক পাশের বেঞ্চিতে ছবি আঁকতে বসলো। আমার পেন্সিল শেষ হয়ে যাওয়ায় সে আমাকে একটি পেন্সিল ধার দিলো। সৌজন্যবশত আমিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পরিচিত হলাম। জানা গেলো তার নাম শাহীনুর রহমান। খুলনা থেকে এসেছে। চট্টগ্রামে কেউ নেই। অচিরেই আমরা কাছের বন্ধু হয়ে পড়লাম। আমাদের বন্ধুত্বের সেই শুরু।

বিশ্ববিদ্যালয়-সময়ে প্রায় ৬ বছর আমরা ছিলাম একসঙ্গে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, বগলের নিচে ক্লিপবোর্ডে বাঁধা কার্টিজ পেপার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় কিংবা শহরে আউটডোরে যাওয়ার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ খুঁজে পেতাম। পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগের সমবয়সীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠলাম। নিজেদের কখনো সেরা শিল্পী, কখনোবা সমাজ পরিবর্তনের নেতা, কখনো বিরহী–এরকম হাজারো পাকামীতে ভরপুর ছিল আমাদের চিন্তা চেতনার জগৎ।

দুপুরে পুরো ক্যাম্পাস হয়ে পড়তো ফাঁকা। সায়েন্স ফ্যাকাল্টি আর কলাভবনের চারুকলার ছাত্ররা ছাড়া কোথাও কেউ নেই। স্যাররাও বেশিরভাগ সময় থাকতেন না। বিকাল নামতেই চা বিস্কুট দিয়ে ঝুপড়িতে জমে উঠতো আমাদের আড্ডা। অবশেষে বিকাল পাঁচটায় শাটল ট্রেনে ফিরে আসা। এই ছিল আমাদের নিত্যদিনের রুটিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরুলাম আজ প্রায় দুই যুগ। কাব্য করে বলায় যায় 'বন্ধুটি আমার পঞ্চাশ বসন্তে পড়লো'। সময়ের এই যে বয়ে চলা, কখনো বা তা ত্যাগের, কখনো বা প্রাপ্তির। সবচেয়ে বড় কথা হলো শাহীন এখনও সুগমের সাথে রুচির সৌন্দর্য প্রচেষ্টায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। আমাদের পুরো জীবন এখন ছকে বাঁধা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে বেশিরভাগ মন পড়ে থাকতো বিভাগের খোলা আঙ্গিনায়। সেই সময়কার ভাঙ্গাগড়ার স্মৃতিগুলো নিয়ে আমরা এখন বড় সুখ স্পর্শ করি। চিৎকার করে বলি–প্রিয় বন্ধু আমার, সব সময় সুখে থেকো।

*জাহেদ আলী চৌধুরী যুবরাজ- চারুশিল্পী ও শিক্ষক*

# Cheerly Cheerly... Love U Dearly

## সত্যজিৎ পোদ্দার বিপু

রাজীব নূরের সঙ্গে পরিচয়, পরে বন্ধুতা না হলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তেমন কিছু না এসে-গেলেও আমার ব্যক্তিগত 'মহাভারত' অশুদ্ধ থেকে যেত, ক্ষতি হতো অপূরণীয়। রাজীবের মাধ্যমে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা সময়ের পরিক্রমায় গভীর থেকে গভীরতর হয়, ওদেরই একজন শাহীনুর রহমান।

চট্টগ্রামের গরীবুল্লাহ শাহ মাজার অতিক্রম করে চাররাস্তা মোড়ের একটু আগে রাস্তার ডানপাশে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ও দোতলার মতন টিনসেডের ছোট দুটি ঘরের একটি রাজীবের আর অন্যটি শাহীনের। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের একটা বড় সময় ওদের বসবাস ছিল ওই দুই ঘরে। রাজীবের চঞ্চলতা, নিমিষেই কাউকে বন্ধু করে ফেলা, অনর্গল কথা বলা, যেকোনো ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আর সাংগঠনিক চরিত্র আমার কাছে যেমন অবাক লেগেছে, তার ঠিক উল্টো চরিত্রের, কথা-কম-বলা বা অহংকারী বা প্রখর ব্যক্তিত্ব, কমমিশুক, ইন্ট্রোভার্টের মোড়কে শাহীন নামক মানুষটিও আমাকে তেমন বিস্মিত করেছে। দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের স্বাধীন বা বোহেমিয়ান জীবনযাপন, চিন্তা-ভাবনার প্রগাঢ়তা ও ব্যাপকতা আমার ওই সময়ের সীমাবদ্ধ রেলওয়ে কলোনি জীবনে খুব বিস্ময় হয়ে এসেছিল। ওরা ওদের জীবনকে নানাআঙ্গিকে, নানাফর্মে স্বাধীনভাবে উপভোগ করছে, ওদের জীবনযাপনের সহজিয়া এই ধরণটা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

শাহীন আর রাজীবের কাছে প্রথম প্রথম যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল ওদের কাঠের সিঁড়ি আর দোতলার দুই ঘরে ঘরময় ছড়ানো-ছিটানো বইয়ের স্তূপ। তেলরং, জলরং ভাস্কর্য-স্কেচময় বাসাটার একটা মোহ ছিল।

রোকন রহমান আর আমি প্রায়ই চলে যেতাম আড্ডা দিতে। আড্ডার সময় ও 'আড্ডারু'র

সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের উষ্ণতাও বাড়তে থাকে শাহীনের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলনে লিটলম্যাগের জন্য আঁকা ব্যতিক্রমী প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন আর ঘরময় কত আড্ডাবাজের ঘোরাঘুরি। কখনো রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বসলেনতো, জীবনানন্দ চলে গেলেন লাশকাটাঘরে, হঠাৎ পঞ্চকবির তুমুল কাণ্ড, তাড়িখোর আমোস টুটুওয়ালার ইংরেজিতে গালাগালি, পিকাসোর যৌনতা এসে কাফকার পোকাটাকে হামলে ধরার সময় ছবিআঁকাফ্রেমে দালির ঘড়ি গলতে গলতে চেগুয়েভারার নিকোটিনের ধোঁয়া শূন্য থেকে মহাশূন্যে বিলীন হলেও তার কড়াগন্ধ এখনো, ২৮-২৯ বছর পরেও বিদ্যমান।

শিল্পীদের বুঝি সাধারণ হতে নেই, অন্যরকম হতে হয় আপাদমস্তক ২৪ ঘণ্টা, প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য সবকিছুতেই শৈল্পিক ছোঁয়া থাকতে হয় শিল্পী হয়ে উঠতে হলে। সম্ভবত গিনিচ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার জন্য ওই কাঠের সিঁড়ির বাসার মলত্যাগের এলাকাটা কখনো ব্রাশ-সাবানের স্পর্শ পেয়েছিল কিনা তা আজ আমার কাছে রহস্যময় বা প্রশ্নবিদ্ধ। আহ, সে এক মারাত্মক শৈল্পিক দৃশ্য!

ঘোড়াপ্রেমীশাহীন নিজের মেধা এবং পরিশ্রমকে অশ্বশক্তির মতোই বিভিন্ন মাধ্যমে অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপস্থাপন করেছে তার যেকোনো শিল্পকর্মে। কত আঙ্গিকে, কত ঢঙে, তার ঘোড়া আঁকা দেখেছি লিটলম্যাগের প্রচ্ছদে কিংবা তার খেরো খাতায়। দিন-রাত পরিশ্রম করে খেয়ে না খেয়ে মায়াকোভস্কি আর র‍্যাঁবোর পোস্টারের প্রুফ দেখার জন্য রাত প্রায় দেড়টার দিকে আমি আর রোকন চলে যাই আন্দরকিল্লার প্রেসে। আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও অদম্য ইচ্ছাশক্তির ফলে আলোর মুখ দেখে পোস্টার দুটি। শাহীন আর রোকনের উচ্ছ্বাসানন্দের দৃশ্য এখনো চোখে ভাসে।

রিকশায় যেতে যেতে অথবা দূরের হাঁটাপথে কিংবা সিঙ্গারা-চা-সিগারেট খেতে-টানতে তৎকালীন সুমন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনমুখী তোমাকে চাই, ইচ্ছে হলো, বয়েস আমার, আরো কত গান গেয়ে একাত্ম হয়েছি।

প্রকৃতিপ্রেমী, অনুসন্ধানীমনোভাবাপন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক, বিশ্বপর্যটক শাহীন ছুটে বেড়িয়েছে ধিক ধিক নদীর ভেতর, পাহাড়ের চূড়ায়, বরফের শীতলতায়, মরুর তপ্ততায়, সবুজের সজীবতায়, সমুদ্রের বিশালতায়, আকাশের অসীমতায়। তীব্র ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে মধ্যরাতে বৃষ্টির সঙ্গে মেঘনায় চিৎ সাঁতারে শরীরকে ভাসিয়ে দিয়ে বুদ্ধকে একান্তে পাবার আকাঙ্ক্ষায় ধ্যানমগ্ন সাহসিকতা একজন শাহীনকেই মানায়।

কোনো বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতিজনের অসুখবিসুখ, আর্থিক সমস্যা বা অন্য কোনো সমস্যায় পড়লে অতিগোপনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া মানুষটি যখনই দেখা হয় তার অফিস কিংবা অন্য কোনোখানে অকৃত্রিম হাসিতে কীভাবে যে কাছে টানে সে এক বিস্ময়!

আপাদমস্তক শিল্পী এই মানুষটিকে শুধু এটুকুই বলতে চাই, Cheerly Cheerly ... Love U Dearly

# শাহীনের জন্য পল্লবীর সঙ্গে একদিন

## জাফর আহমদ রাশেদ

একজন চলে গেলে আর জন আসে
পুরোনো সারথি তবু রটায় বাতাসে,
'এখানে ছিলাম আমি', দরজার ছায়া
শিরায় গুঞ্জন তোলে–এমন বেহায়া।

মাঝে মাঝে বুক শেলফে ইতিউতি খুঁজি,
বিছানা মেঝেতে নেই–এইটুকু বুঝি;
জানালার পর্দা নড়ে, বাঁ-চোখের কোণা
ডান চোখে টোকা দেয়, 'আমি তো যাব না!'

অভ্যাগতদের প্রতি মৌন একাগ্রতা
দিতে গিয়ে বুঝে নিই সব বিফলতা।
উদ্ভাসন অসম্ভব উদ্বায়ী সে নয়
চরাচরে অন্ধকার চোখ খুলে রয়।

যেতে আমি বলি নাই তবুও সে গেছে,
হাত ধরে রাখি নাই তবু সে রয়েছে;
ইন্দ্রিয়ের সীমানায় খেলে কানামাছি,
উদ্বাহু বাতাস বলে, 'আছি আমি আছি।'

['কানামাছি', শাহীনুর রহমান–শিল্পীবন্ধু]

সকালে আমার বাসায় ঢুকেই পল্লবীর প্রশ্ন, 'শাহীন কোথায়?'

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। শাহীনের যে সকাল পর্যন্ত থাকার কথা সেটা আমি জানি না। বললাম, 'ও তো চলে গেছে।'
'কখন?'
'কাল রাতেই।'
পল্লবী কাঁদতে বসে গেল।

১৯৯৭ সাল। ১৯৯৬-এর মার্চে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে আমার বন্ধুরা দল বেঁধে ঢাকা চলে গেছে। জুনে আমার থিসিস জমা দিয়ে আমিও ঢাকা গেলাম। '৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা থেকে একা চলে এলাম চট্টগ্রামে। যোগ দিলাম 'দৈনিক পূর্বকোণ'-এর ফিচার বিভাগে।



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার শেষ দিকে থাকতাম নাসিরাবাদে, 'পূর্বকোণ' অফিসের পাশের বিল্ডিংয়ে। পূর্বকোণে যোগ দিয়ে উঠলাম একই বিল্ডিংয়েই।

পল্লবী আমাদের বন্ধু। জুনিয়র বন্ধু। চারুকলায় পড়ে। শাহীনের সঙ্গে ভাব। তখনো ওর মাস্টার্স হয়নি। তাই চট্টগ্রামেই থাকছে।

আগের দিন শাহীন এসেছে ঢাকা থেকে। পল্লবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সন্ধেবেলা এসেছে আমার কাছে। অফিসের কাজ শেষ করে যা যা করি, হলো। রাত দশটায় হঠাৎ বলল, 'আমি চলে যাব।'

থাকতে বললাম অনেক। থাকল না। সকালে পল্লবী আসবে আমার জানা ছিল না। কিন্তু সকালে পল্লবীকে দেখে, এবং 'শাহীন কোথায়' শুনে বুঝলাম, কোথাও লাইন বেঁকে গেছে একটু করে।

পল্লবীর চোখে জল আসতে না আসতেই শুরু হলো বৃষ্টি। শাহীনের ওপর রাগ হচ্ছে। চোখের জলের সামনে আমার খুব অস্বস্তি হয়।

শাহীন নাই। শাহীনের মন মেজাজ যে রকম, যেকোনো কারণে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে। মোবাইল ফোনের যুগ হলে ওকে এক চোট নেওয়া যেত।

পল্লবীকে বললাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনবে?

পল্লবী কথা বলে না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাকে বেদনার আনন্দ দেয়। পল্লবীর অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে শুরু করলাম 'দেবতার গ্রাস'। রাখালকে যখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো তখন পল্লবী আর আমি রাখালের সঙ্গে নিমজ্জিত হয়ে আছি।

পল্লবীকে বললাম, 'চলো, আমাদের বাড়ি যাই।'

'সে তো পটিয়ায়!' ওর কণ্ঠে বিস্ময়।

আমি আশ্বস্ত করলাম, 'বেশি দূরে না। এক

ঘণ্টার রাস্তা।'

পল্লবী দোনামোনা করে বলল, 'এই বৃষ্টির মধ্যে যাব কীভাবে?'

সম্ভবত সকালে সে নাস্তাই করেনি। টেবিলে ছিল একটা কলা। বললাম, 'কলা খেলে বৃষ্টি থেমে যায়।'

'পাগলামি করবেন না তো!'

'তুমি দেখতে চাও?' আমি বললাম।

পল্লবী হাসল। বুঝতে পারছি মেঘ কেটে যাচ্ছে। মেঘ কেটে গেলে বৃষ্টিও থামবে। বললাম, 'তুমি কলাটা খাও। বৃষ্টি থেমে যাবে।'

সে বিশ্বাস করেছে কিনা জানি না, কিন্তু কলাটা খেল, এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেল।

বহদ্দারহাট বাস স্ট্যান্ডে গেলাম পল্লবীকে নিয়ে। বাসে চেপে পৌছে গেলাম পটিয়ায়, আমাদের বাড়িতে। মাটির বাড়ি আমাদের, দোতলা, বিশাল। সামনে বড় উঠান। পাশে পুকুর। চারপাশ গাছে ঘেরা। আর আমার মা, ভাই, বোন। বাবাও ছিল। তখন সদ্য অবসর নিয়েছেন। আমার বাবার শিশুতোষ কাজকর্ম দেখে পল্লবী হেসে কুটি কুটি।

চমৎকার একটা দিন কাটল আমাদের।

সন্ধেবেলা ওকে নিয়ে আবার শহরে ফিরে আসি। অফিস আর করা হলো না।

পল্লবীকে বিদায় জানিয়ে সবুজে (সবুজ হোটেল) গেলাম আড্ডা দিতে। মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন গুঞ্জরিত হচ্ছে থেকে থেকে, 'শাহীন কোথায়, শাহীন কোথায়?'

সবুজ হোটেল থেকে ফিরে রাত ১২টায় ২ নম্বর গেটে মনির মৃত্তিকদের বাসায় গেলাম রাতের আড্ডার একটা ফিনিশিং টাচ দিতে। রাত ২টায় ফিরলাম বাসায়। আমার রুমমেট, বাড়িঅলার ভাই জসিম ঘুমাচ্ছে। আমি বসে আছি। কে যেন বলেই যাচ্ছে, 'শাহীন কোথায়, শাহীন কোথায়?'

হঠাৎ লাইনটা এল মাথায়, 'একজন চলে গেলে আর জন আসে'।

একসময় শেষ হলো 'কানামাছি'।

*জাফর আহমদ রাশেদ- কবি ও সাংবাদিক*



# এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর

## সাবিরা শাহীনুর পল্লবী

'শাহীনুর রহমান'-এক অনন্য সত্তার যোগ। ভিন্নমাত্রার শিল্পমান আর বিকল্পধারার ভাবনায় আবর্তিত শিল্পী বা ডিজাইনার, কবি বা প্রকাশক অথবা একজন আদর্শ বাবা-যেকোনো মাপকাঠিতে যোগ্যতম হলেও, আমার কাছে ওর বন্ধুতা আর ভালোবাসার নিগূঢ়তাই সর্বাধিক। শাহীনুরের সৃষ্টিশীল ভাবনা এবং কাজকর্ম নিয়ে ইতোমধ্যে অনেকেই বলেছেন এবং জেনেছেন, তাই অন্যভাবে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করছি।

শাহীনুর আমার প্রাণেশ্বর, প্রাণাধিক ভালোবাসা আর প্রেম অপ্রেমের আধার এবং বাবার পরই দ্বিতীয় পুরুষ যার সংস্পর্শে নিজেকে গর্বিত ও প্রশান্তিতে আচ্ছন্ন ঠেকে।

শাহীনুরের সাথে পরিচয় হয়েছিল ডিপার্টমেন্টের কোনো এক কবিতা পাঠের সময়ে; আমি তখন চারুকলার দ্বিতীয় বর্ষে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'যা চেয়েছি, যা পাবো না' দ্বৈত আবৃত্তির প্রাক্কালে অন্য অনুভূতির ঘোরে সেই যে প্রবেশ ঘটেছিল, আজ অব্দি চুম্বক হয়ে ঝুলছি। শাহীনুরের শিল্পীমান, বিষয়ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি এতটাই মোহিত ছিলাম যে, যাবতীয় বিষয়ের সাপেক্ষে তার বর্ণনা শুনতে চাইতাম এবং তখন মাঝে মধ্যেই দু'হাত দুদিকে প্রসারিত করে খুব 'শাহীনুর রহমান' হতে চাইতাম। ধীরে ধীরে জেনেছিলাম-চেষ্টা করে হওয়া যাবে না, তার জন্য সত্তা লাগে। তাই বিয়ের পর তার নিষেধ সত্ত্বেও নামের শেষে 'শাহীনুর' শব্দটা জুড়ে নিয়ে একটা আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলেছিলাম।

ওর কাছেই পাঠ নিয়েছিলাম পরিমিতিবোধের, অল্প বিষয়কে কী করে আনন্দময়তার সাথে দীর্ঘায়িত আর গুরুত্বপূর্ণ করা যায় আর কী করে ছাড় দিয়ে সুখি হওয়া যায়, কী করে সততা আর নির্ভরতার প্রতীক হয়ে সবার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া যায়। বাক্য ব্যয়ে ভীষণই মিতব্যয়ী আর চরমতম দয়ালু শাহীনুর একটা পিঁপড়াকেও বেঁচে থাকার অধিকারে নিজেকে অবলীলায় কামড়াতে দেয়।

সংসারের প্রতি আগাগোড়াই বৈরাগী আর উড়ণচণ্ডী মানুষটি সবকিছু ছেড়েছুড়ে সেই সংসারেই নিজেকে আবদ্ধ করলো যখন, সবথেকে অগোছালো মানুষটিই আন্তঃভাবনায় তুমুল গোছানো আর অনিন্দ্য সৃষ্টিশীলতা দেখিয়ে ফেলে যখন, জটিলতম বিষয়ভাবনার সাথে সাথে স্বভাবে চরম শিশুসুলভতা প্রকাশ করে যখন–তখন বলতেই হয় বরাবরই সে দ্বৈততায় ভর করে চলা মানুষ। সম্ভবত তার সৃষ্টিশীল কাজেও সেই ছাপ রয়েছে। বোধকরি ছোটবেলার বাধ্যতামূলক প্রচণ্ড ধর্মীয় পরিমণ্ডলে জীবন যাপনের পাশাপাশি নিজের শিল্পসত্তাকে লালন করতে গিয়েই দ্বৈরথের সওয়ারি হয়ে ওঠে শাহীনুর।

শাহীনুরের পঞ্চাশতম বা স্বর্ণ বসন্তের আধেক রৌপ্য বা পঁচিশতম বসন্ত অব্দি আমরা পরস্পরের সম্পূরক হয়ে আছি। যদিওবা মনে হয় কখনো 'ও যা বলে, যা করে, আদৌ কি তার ভেতর সে থাকে? যতই সহজশিশু হোক, সে কোনো দেবতা অথবা দূর গ্রহবাসী হঠাৎ পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে ভালোবাসায় আবর্তিত হয়েছে। তার কথা, স্বভাব বা বিষয়ভাবনায় এতটাই ভিন্নতা ধারণ করে যে, ওকে অন্য গতি, অন্য সময়ের অথবা অন্য অবস্থানের মতো অচেনা মনে হয় কখনোবা।

পরিশেষে, এই পঁচিশ বছরে অনেকভাবেই আমরা সম্পর্কিত হয়েছি, কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকা, বর-বউ, সন্তানের বাবা-মা... সবকিছু ছাপিয়ে শাহীনুর আমার পরমতম বন্ধু, আত্মার আত্মীয়, যোগ্য সঙ্গী।

*সাবিরা শাহীনুর পল্লবী- চারুশিল্পী*



## যোগসূত্র

### তারেকুল ইসলাম

তখন পড়ি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। সেটা ১৯৯৬-৯৭ সালের কথা। বিষয় ছিল ব্যবস্থাপনা (সম্মান)। তো নতুন সহপাঠীদের কারো কারো সাথে আলাপ পরিচয় হচ্ছে। কে কোথা থেকে এলো, কার বাড়ি কই–ইত্যাদি। এমনি করেই একদিন একজনের সাথে আলাপ করতে করতেই জেনে গেলাম সে আমার বড়বোনের দিককার আত্মীয়। যদিও খুলনায় তাদের বসতি, কিন্তু আদি নিবাস নোয়াখালী।

আমি তখন পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি করছি অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'সংগীতা'য়– ক্রিয়েটিভ ও মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে। পাশাপাশি করছি থিয়েটার, এস এম সোলায়মানের সাঙ্গপাঙ্গ হয়ে। সে জানালো তার বড়ভাই একজন আর্টিস্ট এবং তাদের প্রি-প্রেস ডিজাইনিং হাউস আছে নয়াপল্টনে। একদিন গেলাম তাদের প্রতিষ্ঠান 'ডিঙ্গা'য়। প্রথম আলাপেই তার বড়ভাই আমার বন্ধু হয়ে গেল। সেই বড় ভাই হলেন শাহীন ভাই। আর ছোট ভাই টিপু হয়ে গেল দূরের!

ইতোমধ্যে শাহীন ভাইকে দিয়ে সংগীতার কিছু স্পেশাল কাজ করাচ্ছি। যোগাযোগ বাড়ছে, সম্পর্ক দৃঢ় হচ্ছে। সোলায়মান ভাই এই সময় ধরলো গোলাপজান নাটক। গোলাপজান-এর পোস্টার করতে হবে। গেলাম শাহীন ভাইয়ের কাছে। হাসিমুখে বিনা পারিশ্রমিকে করে দিলেন দুইরঙা সেই পোস্টার। সেই থেকে শাহীন ভাই হয়ে গেলেন 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট'-এর এক

অবিচ্ছেদ্য অংশ। গোলাপজান থেকে থিয়েটার আর্ট ইউনিটের সব নাটকের কিংবা উৎসবের বা যেকোনো ইভেন্টের সমস্ত প্রকাশনা, দৃশ্যসজ্জা- সবই তার সৃষ্টি। কমার্শিয়াল কাজের তোয়াক্কা না করেই করে দিয়েছেন সব। তিনি একা নন, তার পুরো প্রতিষ্ঠানকে তিনি ইনভল্ভ করিয়ে ফেলেন থিয়েটারের যেকোনো নাট্যযজ্ঞে।

আমি একসময় থিয়েটার এরেনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি কিন্তু শাহীন ভাই এখনও হারিকেন হাতে নেপথ্যে থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, সৃষ্টি করে চলেছেন।

আমার সাথে শাহীন ভাইয়ের একটা জায়গায় ব্যাপক মিল। সেটি হচ্ছে কারো সাথে না বনলে, দ্বন্দ্বে না গিয়ে সরে যাওয়া। নিজের মতো করে থাকা। শুনেছি শাহীন ভাই তার মাস্টার্স সার্টিফিকেট না নিয়ে চলে এসেছেন তার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ডিঙ্গা নামে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন বন্ধুর সাথে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ছোট ভাইকে নিয়ে করলেন 'ফ্ল্যাশ'। মাঝে আরো একজনের সাথে ডিজিটাল সাইনের যৌথ ব্যবসা করতে গিয়ে সেখান থেকেও ঠকেই বেরিয়ে এসেছিলেন। ফ্ল্যাশে ছোট ভাইয়ের নানাবিধ ঝামেলা তৈরির কারণে ব্যাপক মনোকষ্ট নিয়ে একাই গড়ে তুললেন আজকের 'রেডলাইন'। এর মধ্যে দেখেছি চেনা-অচেনা অনেকের কাজ করতে গিয়ে পয়সাপাতি ঠিক মতো আদায় না করেই সরে এসেছেন, দ্বিতীয়বার ওমুখো হননি।

কাজের কোয়ালিটির ব্যাপারে শাহীন ভাইকে দেখেছি আপোসহীন। নিজের চোখে ছাপা পছন্দ হয়নি বলে কত এনজিওর কাজ আবার নতুন করে ছেপে দিয়েছেন, নিজের অর্থনাশ মাথায় না রেখেই! সহকারীদের দিয়ে হয়ত কোনো ডিজাইন দাঁড় করিয়েছেন কিন্তু মনমতো হয়নি, সেটা আবার নিজের সময় ব্যয় করে যত্ন সহকারে করে দেন। আমি মনে করি না ওনার কাজের যেই মান, সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক তিনি পান। সবাই চায় বেস্ট কোয়ালিটি কাজ, কিন্তু পয়সার বেলায় 'ফকিরাপুল রেট'।

থিয়েটার দলগুলোর আর্থিক অবস্থা তিনি জানেন। তাই তিনি বিনা পারিশ্রমিকে হাসিমুখে পোস্টার, ব্রোশিওর, প্রচ্ছদ, সেট, বহিরাঙ্গনের সাজসজ্জা সবই করে দেন নিজ হাতেই।

এই ভদ্রলোকের একটা বড় দোষ, তিনি ছবি আঁকতে চান না। তিনি যেই মানের শিল্পী, এতদিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তার অনেকগুলো এক্সিবিশন হবার কথা। অন্তর্মুখী স্বভাবের কারণে দেশে ও দেশের বাইরের চিত্রশিল্পীদের সাথে তার যোগাযোগ ভীষণ কম।

আজ গুণীজন শাহীন ভাই পঞ্চাশ পাড়ি দিয়ে ৫১তে যাচ্ছেন। জন্মদিনে ভালোবাসা শাহীন ভাই, শিল্পী শাহীনুর রহমান।

*তারেকুল ইসলাম- নাট্যকর্মী ও সখের ফটোগ্রাফার*



## শাহীনুর রহমানের প্রত্নপিপাসা

তরুণ সরকার

কথুনাথের দেবালয়ের কথা উল্লেখ আছে যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে। বলা হয়েছে, 'রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাক্ষ্যা নদী তীরবর্তী ডাঙ্গাবাজ গ্রামের সন্নিহিত তালতলা গ্রামে সাধকশ্রেষ্ঠ কথুনাথের সমাধি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সাধনামন্দির অবস্থিত। গ্রন্থে থানা, অঞ্চল, গ্রামের নাম সবই স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে। কিন্তু দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও আমরা জায়গাটি শনাক্ত করতে পারছিলাম না।

কথুনাথের সময়কাল মুঘল আমল। সতের শতকের মধ্যভাগ। কথুনাথ জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের সাধক। জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সংগঠক রামকৃষ্ণ গোসাঁইয়ের শিষ্য তিনি। কথুনাথের দেবালয়ের সন্ধান পেতে আমরা যোগাযোগ করি জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও ভক্তদের সঙ্গে। তাঁরা জানান, শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে তাঁদের একটি আখড়া আছে বলে শুনেছেন। তবে আখড়াটির সুনির্দিষ্ট অবস্থান তাঁরা জানেন না। যতীন্দ্রমোহন রায়ের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলের শেষভাগে। এরপর প্রশাসনিক ভাগ, গ্রামের নাম ইত্যাদি পরিবর্তন হতে পারে। যতীন্দ্রমোহন রায়ের পরবর্তী কোনো গবেষক এ নিয়ে আর কিছু লিখেননি। আমরা খোঁজ করতে থাকি এবং এক পর্যায়ে নিশ্চিত হই, যতীন্দ্রমোহন রায়ের গ্রন্থে উল্লিখিত 'ডাঙ্গাবাজ' নামে শীতলক্ষ্য নদীর তীরে কোনো গ্রামের অস্তিত্ব এখন নেই। তবে ডাঙ্গা নামে একটি গ্রাম আছে। তবে সেটি রূপগঞ্জ থানায় নয়- নরসিংদী জেলার পলাশ থানায়। এ অবস্থায় আমরা শীতলক্ষ্যার তীর ধরে রূপগঞ্জ ও পলাশ থানা অঞ্চলে সরজমিন অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ভোরবেলায় ঢাকা থেকে আমরা গাড়ি নিয়ে রওনা হই। শাহীন, সত্যজিৎ, কল্লোল ও আমি। পথে যুক্ত হয় শীতলক্ষ্যা তীরবর্তী জনপদের সন্তান মোয়াজ্জেম। পাঁচদোনা হয়ে ডাঙ্গা যাওয়ার পরিকল্পনা হয়। পাঁচদোনায় আমরা গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি পরিদর্শন করি।

এরপর শুরু হয় দেবালয়ের খোঁজ। হেরিটেজ ভবন দেখার পর দুপুরবেলায় পৌঁছি ডাঙ্গা বাজারে। শীতলক্ষ্যার তীরে বেশ বড় বাজার। আমরা স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসা করি কথুনাথের দেবালয়ের কথা। না, এ ধরণের কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা তারা অবগত নন। আমাদের আকুতি দেখে স্থানীয় জনগণের দয়া হয়। তারা আমাদের আশে-পাশের গ্রামের মন্দিরে পাঠাতে শুরু করেন। ৪/৫টি মন্দির দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু কাঙ্খিত দেবালয় মিলছে না। বেলাও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এমন সময় স্থানীয় এক মহিলার কাছ থেকে জানতে পারি, 'দেবাল' নামে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে। আমরা ছুটে যাই দেবালের দিকে। শেষ বিকেলে 'দেবাল'-এ গিয়ে আমরা আপ্লুত হয়ে পড়ি। পরিত্যক্ত আখড়া। কিন্তু এখনও টিকে আছে মুঘল আমলের দুটি প্রাচীন সমাধি মন্দির।

কথুনাথের দেবালয় খুঁজে পাওয়া শাহীনের স্থাপত্য অনুসন্ধান কর্মের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। শাহীন জানা এবং অজানা প্রাচীন স্থাপত্যস্থলে যায়। দেশ ও বিদেশের প্রত্নস্থলে যায়। মন্দির, মসজিদ, গির্জা, বিহার, আখড়া, সমাধিসৌধ, কাটরা, দুর্গ, প্রাসাদ, তোরণ, ইমামবাড়ায় যায়। সুযোগ পেলেই চলে যায় প্রাচীন স্থাপত্যস্থলে। আবার সুযোগ করেও নেয়।

শাহীন ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে যুক্ত। কমিটির গত ১০ বছরের সময়কালে বিভিন্ন গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত প্রত্নস্থলে শাহীন গেছে বার বার। কখনো দল বেঁধে, কখনো একাই। তবে প্রাচীন স্থাপত্য পরিদর্শনের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা তার আগে থেকেই ছিল। নব্বুইয়ের দশকের শেষভাগে শাহীন, রাজীব, লিটনের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম দক্ষিণবঙ্গ পরিভ্রমণে। কুষ্টিয়া থেকে শুরু হয়েছিল। খুলনা, বাগেরহাট, নড়াইল হয়ে গোপালগঞ্জে শেষ হয়েছিল সেবারের যাত্রা। এক অসাধারণ পরিভ্রমণ ছিল সেটি। ষাট গম্বুজ মসজিদ তখন প্রথম দেখি। দক্ষিণবঙ্গের সুলতানি ও মুঘল আমলের বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তখন সঙ্গগুণে। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহীন ও পল্লবীর সঙ্গে হাওরে গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি সুলতানি আমলের কুতুব মসজিদে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের প্রতি শাহীনের রয়েছে বিশেষ টান। তাই বলে বিশ্ব স্থাপত্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয় শাহীন। বরং বাংলার স্থাপত্যের পাশাপাশি বিশ্ব স্থাপত্য ঐতিহ্য অনুধাবনেও বেশ নিষ্ঠাবান। মিশরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেছে সেদেশের প্রাচীন স্থাপত্য। এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ ভ্রমণ করেছে মূলত প্রাচীন স্থাপত্য পরিদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়ে। শাহীনের মতো বাংলাদেশে আর কোনো শিল্পী এমন গভীর মগ্নতায় প্রাচীন স্থাপত্য নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করেছেন কি-না কে জানে। স্থাপত্য ভাবনার প্রভাব পড়ছে শাহীনের শিল্পে, শাহীনের কর্মে, ইন্সটলেশন আর্টে-নাটকের সেটে-নকশায়। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমির বইমেলায় শাহীনের ডিজাইন করা বাতিঘরের স্টল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। মুঘল স্থাপত্যের আদলে সাজানো হয়েছিল স্টলটি। ঢাকার স্থাপত্য ঐতিহ্য স্মরণ রেখে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে 'বাতিঘর'র এমন ডিজাইন করা হয়েছে, প্রবেশ করলে মুঘল স্থাপত্যের অভ্যন্তরে অবস্থানের অনুভূতি হয়। প্রাচীন স্থাপত্য পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তন এখন শাহীনের শুধু আগ্রহেরই বিষয় না- এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। স্বভাব বশে শাহীন তাই প্রাচীন স্থাপত্য পরিদর্শন করে চলছে নিরন্তর।

*তরুণ সরকার- গবেষক ও ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার*



# সুবর্ণে শিল্পী শাহীনুর রহমান

## হাফিজ রশিদ খান

শাহীনুর রহমানের শিল্পীসত্তায় বহুত্ববাদী চট্টগ্রাম অঞ্চলের নানারঙের ছোপ লেগে আছে। এ রঙ সৃজনের। এ রঙ আনন্দের। এ রঙ যুগ-যুগ বুকে বয়ে বেড়ানোর।

গত শতকের নব্বই দশকে খুলনার তরুণ শাহীনুর যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী তখন একই শিক্ষায়তনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরেক তুখোড় ছাত্র, গল্পকার রাজীব নূরের মাধ্যমে ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। মিতবাক, রঙ ও তুলির সৃজনী বৈশিষ্ট্যের শাহীন তখন ক্যানভাসের বুকে খুবই সচল, সম্যক মনোযোগী। ওই সময়ে তার আঁকা 'ঘোড়া সিরিজ' তাকে বেশ পরিচিতি দেয় ক্যাম্পাস ও নগর লোকালয়ে। বিচিত্র ভঙ্গিসহ ওই ধাবমান অশ্বের ফ্রেমবন্দি–ওসব কাজ এখনো চোখে ভাসে। রাজীব নূর, শাহীনুর রহমান, কবি জাফর আহমদ রাশেদ, কবি অলকা নন্দিতা, ওদের আরো জনাকয়েক বন্ধুসহ ওই সময়ে গুলকবহরে আমার চিলেকোঠায় বসা হতো শিল্পসাহিত্যের নানা বিষয়ের আলাপচারিতায়। কাফেলাটির মধ্যমণি রাজীব নূর–বিশ্ববিদ্যালয় আর নগরের সুধী সংসর্গে খুব চৌকস যোগসূত্ররচনাকারী। শাহীনের শিল্পসৃজন, জাফর-অলকার কাব্যচর্চা, নিজের গল্পের শরীরে নতুন আবহরচনা–এসব নিয়ে রাজীবের সে এক চঞ্চল সময় বইছিল তখন। সবাইকে তিনি এক সুতোয় গেঁথে রেখে আড্ডা, লিটলম্যাগ আড্ডারু প্রকাশ, শাহীনুরের চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন–খুব উদ্যমী ও সুচারুভাবেই সম্পন্ন করছেন।

১৯৯২ সালের শেষদিকে উদ্যোগী হলাম সাহিত্যপত্র পুষ্পকরথ প্রকাশে। দেবাশিস ভট্টাচার্য ও রাজীব নূরের গল্প, খোকন কায়সারের প্রবন্ধ, মিরোস্লাভ হোলুবের মহীবুল আজিজকৃত ঢাউস সাক্ষাৎকারের অনুবাদ, ও-বাংলার উদয় নারায়ণ সিংহের ভাষাতাত্ত্বিক দীর্ঘ গদ্য আর তরুণদের একঝাঁক কবিতা নিয়ে পুষ্পকরথ উড়াল দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ওই রথের বহিরঙ্গের শোভাবর্ধন করবে কে? নাম এলো শাহীনুরের। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে পুষ্পকরথ চাঁদের চরে ভিড়লো ওরই করা প্রচ্ছদ আর নামলিপিসহ।

বলে রাখা ভালো, শাহীনুরের করে দেয়া পুষ্পকরথ নামলিপিটি এর সকল সংখ্যায় শিরোধার্য হয়ে আছে আজতক। ১৯৯৩ সালেই ওটা 'মুক্তধারা'র তরুণ প্রচ্ছদশিল্পী পুরস্কার জিতে নিল। প্রচ্ছদশিল্পকর্মের বিষয়বস্তুও ছিল দারুণ আকর্ষক; এক বুনো, বিক্ষুব্ধ হাতি ওর শুঁড়ে আর রাগী পায়ের তলায় তছনছ করে ফেলছে বিশ্বভুবনের সব অনিয়ম, কুৎসিত ও ঘনীভূত সমস্ত অন্ধকার। ওর সম্মুখগতি রুখে সাধ্য কার?

এদিকে ১৯৯৩ সালকে জাতিসংঘ ঘোষণা করলো 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ'। বাংলাদেশের পার্বত্য জাতিসমূহের ওপর সেই ব্রিটিশ-পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে আচরিত ও প্রদর্শিত নানা বঞ্চনা, নিপীড়ন ও অবহেলার বিরুদ্ধে একটা কিছু করতে হবে। এ নিয়ে আমার সম্পাদনায় বছরটির শেষদিকে (অক্টোবর) বেরুলো 'বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত' নামের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার একটি বই। এদেশের বাংলাভাষি বুদ্ধিজীবীদের পাশে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অগ্রসর চিন্তার মানুষেরাও এতে প্রাণ খুলে লিখলেন। সেই বিশাল দিস্তান অবশ্য এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এখানকার জন্য যা প্রয়োজনীয় তথ্য, তা হলো–গ্রন্থটির প্রচ্ছদকার ছিলেন শাহীনুর রহমান। চট্টগ্রাম শহরে সেই সময়ে রহমান নগরের ডেরায় (নাকি ২ নম্বর গেট এলাকায়!) এ নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ হলো। এ গ্রন্থের পরিকল্পনায়, বিষয়বস্তুর দাবিতে পাঁচটি পর্ব রাখা হয়: 'আদিউৎসের সন্ধানে', 'সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ', 'ভূ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত', 'সম্ভাব্য সমাধান ও অন্যান্য', ও 'সাক্ষাৎকার'। শাহীন প্রচ্ছদ রচনার পাশাপাশি ওই পাঁচটি পর্বের জন্যে পাঁচটি প্রাসঙ্গিক ইলাস্ট্রেশন করে দিলেন অতি মনোযোগ আর নৈপুণ্য আর সুসংগতির সাথে। গ্রন্থটির কুলীনস্তরে উপনীত হতে ওর ওই অবদান আমরা সকলেই স্বীকার করি–যারা সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমরা মানে, বান্দরবানের সন্তান শৈ অং প্রু, মংক্যশোয়েনু নেভী, গল্পকার খোকন কায়সার।

সেই যে আমি শাহীনুরের অঙ্কনশৈলীর মুরিদ হলাম, সেই ঘোর তো আর যায় না। সেবার ওকে পাকড়াও করি আমার কবিতাপুস্তিকা স্বপ্নখণ্ডের রোকেয়া বেগম রুকুর (১৪০২ বাংলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫) মলাটটি সাজিয়ে দিতে। সদা সহাস্য, স্বল্পবাক শাহীন ওই পুস্তিকার গা-গতরে তার নান্দনিক আঁচড় লেপে দিলে আমার প্রাণে শান্তি আসে।

প্রথমে শাহীন, পরে রাজীব, জাফর ও অলকা নন্দিতা ঢাকায় থিতু হলো নব্বই দশকের শেষ প্রান্তে। এবার বুঝি সুতোটা ছিঁড়ে যায়-যায় অবস্থা। জীবনের গতি চলেছে বহুমুখী সড়কে, মেঠোপথে, নদীপথে আর আকাশ বেয়ে। রাজীব তবু মাঝে-মাঝে ঘাই মারে, হাফিজ ভাই, কবিতা পাঠান! ও তখন দৈনিক লাল-সবুজ, দৈনিক ইত্তেফাক–এসব কাগজের সাহিত্যপাতা দেখছে। ২০০২-এ বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শাহীনুর রহমানের প্রচ্ছদে বেরোয় আমার কবিতার বই টোটেমের রাতে হত্যাকাণ্ড (প্রকাশক : শ্রাবণ)। এও ভারী সুন্দর, ব্যতিক্রমী কাজ তার। শিল্পী শিশির ভট্টাচার্য্যের ড্রয়িং নিয়ে অভিনব প্রচ্ছদ। প্রথম নজরেই

হাতে উঠে আসা নান্দনিকতায় ভরা সুদূর প্রত্নতাত্ত্বিক সময়ের সম্ভাষণ যেন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ 'পাঠসূত্র'-ঢাকা প্রকাশ করলো আমার সংগৃহীত ও অনূদিত আদিবাসীদের কবিতা সংকলন অরণ্যের সুবাসিত ফুল। প্রচ্ছদে মনোময় ঝোপের ভেতরে অনিন্দ্য রূপময় জোনাকি দলের মেলা বসেছে, এমন এক প্রতিবেশ বিষয়টিকে সঠিকমাত্রায় খোলাসা করতে সক্ষম হয় শাহীনেরই জাদুমাখা মোহনস্পর্শে।

এই গদ্যের অভিমুখ শিল্পী শাহীনুর রহমানের সুবর্ণে পদার্পণ। বয়োক্রমের অনিবার্য ধারায় পঞ্চাশে এলেন আমাদের প্রিয়মুখ, বন্ধু ও শুভার্থী। এই অকিঞ্চিৎ লেখকের কয়েকটি বই আর সম্পাদিত সাহিত্যপত্রের প্রচ্ছদকার–এ মোটেও নয় তার মূল পরিচয়। ওসব তো নাছোড়বান্দার প্রতি বিনয়ীর অর্ঘ্যমাত্র! ক্যানভাসের বহুবর্ণিল, জীবনদ্যুতিময় ব্রাশের চারুতায় তার যে-পরিচয় খোদিত হয়ে আছে ফেলে আসা দিনগুলোতে, সেখানে শক্তিমন্ত শিল্পীর অবয়ব 'শাহীনুর রহমান'। ব্যষ্টি ও সামষ্টিকের আনন্দ ও বেদনার, ক্ষোভ ও ক্রোধের, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের, ভালোবাসা ও অবদমনের, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার শিল্পী শাহীনুরের একটি মনমতো স্কেচ রচনা, আসলেই ব্যাপক দুরূহ বটে–এ লেখকের পক্ষে।

তার শিল্পকর্মের গহন আলোছায়া ও বীথিকাশোভিত দূর পথরেখায় ক্ষণপ্রভার দ্যুতিতে ব্যক্তিমননের দুর্ভেদ্য দুর্গকে যেমন প্রত্যক্ষ করি, তেমনি অনবগুণ্ঠিত, পক্ষবিস্তারী বিহঙ্গের মতো অকূল আসমানের স্তর পেরিয়ে নাদব্রহ্মে অবতরণ করি মনের হরষে। আমাকে এ দুর্লভ, পার্থিবতাময় অলৌকিকের স্বাদ দিয়েছে ওর প্রাতিস্বিক শিল্পকর্ম। আমার বেদনাকে মহৎ করেছে। আমার আনন্দকে ভূলোকের মানুষের কাছে এনে দিয়েছে ওই শিল্পকৃতি। ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েও ব্যর্থ হয় আমার অনুভূতির যেসব রাঙা-উল্লাস, শব্দের পাঁজর ভাঙতে চায় আমার চেতনার যে উল্কাপিণ্ড, শাহীনুর তার চারুকর্মে, রঙের বিভাসে সেখানে আমাকে চমকিত ও নমিত করেছে।

আরো পরে শাহীনুর তার কাজের পরিধি বাড়িয়েছেন। 'ইন্সটলেশন' (Installation) বা স্থাপনাশিল্পে তার প্রতিভার ছোঁয়া নতুন স্পর্ধা ও সামর্থ্যকে খুলে দিয়েছে সুধীসমাজে। এ ধারায় তার কাজের বৃহৎ আয়োজন, নির্মিতির সাযুজ্য, পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত রচনার সবিশেষ মুনশিয়ানা বিস্মিত, হতবাক করে শিল্পবানকে। তার রচিত নন্দন-সমুদ্রে সাঁতরে জীবনের সত্যিকারের সুখ পাওয়া যায়।

সুবর্ণে শাহীনুর রহমান ভুবনের আলো হয়ে জ্বলতে থাকুন, এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।

*হাফিজ রশিদ খান- কবি ও আদিবাসী বিষয়ক গবেষক*



## ভূমিকা রেখেছি মাত্র, সামনের বসন্তে আবার হবে

আলফ্রেড খোকন

শাহীনের সঙ্গে দৃশ্যত কবে কীভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল, সে স্মৃতি মনে করতে পারছি না। কারণ, অনেক স্মৃতি আসতে চাইছে, স্মৃতির এতই ভিড় যে, কিছু স্মৃতি আপনা-আপনি পিছিয়ে পড়ছে।

মগবাজারস্থ ওয়ারলেস গেটের কাছে ক্যান্টন নামক রেস্তরাঁর সম্ভবত তিন তলায় ওর অফিস ছিল 'রেডলাইন'। 'রেডলাইন' বলতে সাধারণত বাংলায় মনে আসার কথা 'লালরেখা'। কিন্তু বিষয়টা শাহীন হওয়ায় মনে আসল 'রেডলাইন জোন' টাইপের কোনো এক অজানা অনুভূতি। সম্ভবত ২০০৪ সাল পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের কাছে ওর অফিস ছিল। সেখানে আমার যাওয়া হয়নি। ওয়ারলেস গেট থেকে সেগুনবাগিচা যাওয়ার বছর কয়েক আগে, ধরা যাক আজ থেকে ১৪/১৫ বছর আগে দৃশ্যত ক্যান্টনের রেডলাইনেই আমার সঙ্গে ওর সখ্যের পাঠ শুরু। যদিও কবিতা আর তুলির স্পর্শ এর অনেক বছর আগেই আমাদের দুজনের মধ্যকার সংযোগ ঘটিয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল প্ল্যাটনিক পর্যায়ে। ফ্রয়েডীয় পর্যায়ে (গাঢ় সম্পর্ক অর্থে) আসতে একটু বিলম্ব হচ্ছিল কোনো অজানা কারণে। এর মধ্যে শাহীন প্রায় ছবি আঁকা থেকে মুখ লুকিয়ে নিয়েছে, সেও কোনো অজানা অভিমানে।

সম্পর্কের এক পর্যায়ে আমরা মাঝে মাঝে পানিপিয়াসী হয়েছি। ক্যান্টনস্থ অফিসে দু-একবার পানি আর খাদ্য নিয়ে কাব্যকলার উছিলায় বেশ কিছু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করে বেড়িয়েছি এক অন্যরকমের স্পর্ধায়। তবে ক্যান্টনস্থ রেডলাইনে আমার একটি বইয়ের মলাট আঁকা নিয়ে কথা চলতে চলতেই শুনলাম সেগুনবাগিচায় ওর অফিসের স্থানান্তর ঘটছে। তারপর অনেকদিন সেগুনবাগিচার অফিসে, জীবনের নানান প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের যৌথ আড্ডা চলে। শাহীন তুলনামূলক কথা কম বলত এবং শুনত বেশি। তবে যেদিন বলত, সেদিন বেশ বলত। এরকম মুহূর্তগুলোতে দ্রুত সন্ধ্যা হয়ে আসত। এবং ডা. কল্লোল কিংবা রসুল ভাইয়ের আগমনী টের পেতাম। এবং তাদের আগমনী জানিয়ে দিত এখন আর ঢাকায় বসে কোনো কথায় মনোনিবেশ নয়–সরাসরি রূপগঞ্জ। আমি এ পর্যন্তই। ওদের রূপগঞ্জের আড্ডায় কখনো যেয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু বহুবার যাবার প্রসঙ্গ এসেছিল।

এই সময় শাহীনের নানা রকমের আসক্তি ছিল। যেমন 'ও যদি গাড়ি চালাত তো চালাতেই থাকত। যদি ধূমপান করত, করতেই থাকত। আমার আসক্তি ছিল একটা বিষয়েই। ফলে অনেক বিষয়ের মধ্যে ঢুকতে না-পারায় ধীরে ধীরে আমাদের দূরত্ব বাড়তে লাগল। এই দূরত্বের মধ্যে হঠাৎ কোনোদিন ওর কিংবা আমার ফোনে দুজনের দেখা হয়ে যেত। এবং

অবশ্যই বড়জোর আমাদের ঠাকুরবাড়ির আঙিনা অর্থাৎ 'সাকুরা' পর্যন্ত যৌথ গন্তব্য নির্ধারিত হতো। এইভাবে দিন যেতে থাকল। একদিন নিউ ইস্কাটন রোডের বাসিন্দা আমাদের বন্ধু তারেকুল ইসলাম জানাল সে তার চিলেকোঠার বাসাটি ছেড়ে দিয়ে মিরপুর চলে যাচ্ছে। এমন কী, নাটকের দল 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট' ছেড়ে দেয়ার একটি বিয়োগান্তক গল্পও শুনিয়ে দিল। তারেক অনড় পাথর। 'ও যা বলেছে তা থেকে একচুলও নড়বে না। বন্ধুত্বের বাইরে দীর্ঘদিনের উপর-নিচ প্রতিবেশী সম্পর্ক আমাদের। ওর চিলেকোঠার বাসায় বহুদিন আমরা গান গেয়েছি, তাস খেলেছি, পান করেছি, আড্ডা মেরেছি, গরম ভাতও খেয়েছি। কখনো কখনো সারারাত কাটিয়ে দিয়ে ভোর ডেকে এনেছি। সে এক মাতাল সময়। ওরকম সময় জীবনে বসন্তঋতুর মতো একবারই আসে। তারেক হঠাৎ বাসা ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়ায় আমার মাথায় একটি আইডিয়া এলো। ছবি আঁকতে না পারলেও রঙতুলি অপচয় করতে আমার দারুণ লাগে। ভাবলাম এটাকে স্টুডিও বানিয়ে ফেলি। শাহীন ১৪ বছর ছবি আঁকে না। ওর জন্য এটা হতে পারে স্টুডিও। আমার জন্য অবসর। ওরও এটাতেই আসক্তি জমে উঠতে পারে। এইসব বান্ধব ভাবনা মনে নিয়ে একরকম যুক্তিবুদ্ধি করে শাহীনকে প্রস্তাব দিলাম। তারেকও উৎসাহ দিল। এমন প্রস্তাবে 'ও ভেবে একদিন রাজি হয়ে গেল। আমরা সমান ভাগে ভাগাভাগি করে এর মাসিক অর্থনৈতিক দায় পরিশোধ করতে শুরু করলাম। তারেকের সমর্থনসহ আমাদের
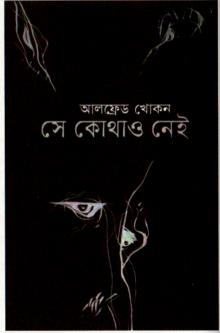
ব্যক্তিগত পরিচয়ে বাড়িওয়ালী আমাদের কাছে ঘর ভাড়া দিল। শুরু হলো আমাদের আরেক তুমুল অধ্যায়–ছবি আঁকার। আমরা দুজনে মিলে ছবি আঁকতে শুরু করলাম। 'ও একটু দেরিতে শুরু করল। চৌদ্দ বছর পর আবার শুরু করতে একটু মনসংগঠনের জন্য যেটুকু সময় ভাবনাবিরতি দরকার, ততটুকুই। এই সময়ে আমরা দুবন্ধু এক ঘরে, এক কামরায় বসে কেউ ছবি আঁকছি, কেউ গল্প করছি, কেউ শুয়ে শুয়ে মোবাইল ফোনে গান শুনছি। দুজন দুজনের কাছাকাছি বসে চোখ কিংবা মন পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছি। এইভাবে আমাদের কাটতে থাকল বছরের পর বছর। ছবি আঁকার চেয়ে আড্ডায় সময় পার হতো বেশি। শিক্ষক-সাংবাদিক-শিল্পী-কবি-লেখক ও রাজনীতিক, সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সমাগম ঘটতে থাকল দিনের পর দিন। তাস খেলাও হতো। বলা উচিত, যেভাবে সময়ের সংঘটন একটি মননশীল যাত্রাকে ঐশ্বর্যশালী করে, তেমন আড্ডায় আমাদের সময় পার হতে থাকল। এমনও হয়েছে কোনো সপ্তাহে আমরা শুধু জ্যোৎস্না পান আর জল অবগাহন করতাম। সময় মাতাল হয়ে ফিরে যেত। কখনও সাঁইজির গানে পেরিয়ে যেত রাতের কয়েক প্রহর। ছবির নেশায়, কবিতার নেশায়, জ্যোৎস্নার নেশায় আমরা ভুলে যেতাম ঘরবাড়ি। ছাদে শুয়ে পড়তাম। দোলনায় দুলতাম। দালানের উচ্চতাকে ডিঙ্গিয়ে চাঁদ উঠতে উঠতে রাত গভীর হয়ে যেত। শাহীনের সহচর চিত্রশিল্পী পল্লবীর হঠাৎ ফোনে সম্বিৎ ফিরে পেতাম আমরা সবাই। তাড়াহুড়ো করে কখনো কাজ অসমাপ্ত রেখে ঘরে ফিরতাম।

কিছুদিনের জন্য আবার শাহীন হাওয়া। 'কোথায়?' ফোনের অপর প্রান্তের উত্তর–'রূপগঞ্জ'। রূপগঞ্জের কী অপরূপ মহিমা, জানা হলো না আজও। কারণ, পূর্বেই বলেছি, যাব যাব করে যেতে পারিনি।

শাহীনের কাজের মধ্যে এমন একটা পরিচ্ছন্ন চোখ, একটা অপরিহার্য অনুভূতি, একটা বিপরীত চিন্তারেখা সর্বদাই ওর কাজকে স্বতন্ত্র মহিমা দেয়, যা না বললেই নয়। আমি মনে করি শাহীনুর রহমানের সব কাজ বা সৃজনেই তা কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান। এই বিশেষত্ব নিয়েই কাটতে থাকল দিন। কখনো সাহিত্য পুরস্কারের ক্রেস্টের ডিজাইন, কখনো লিটল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, কখনো থিয়েটারের সেট ডিজাইন–যে যেভাবে ওর কাছে বায়না ধরে, 'ও পরিশোধ করে। কখনো পারিশ্রমিক নেয় না। এটা একটা অদ্ভুত ক্ষমতা যা শাহীনকে আরও বিকশিত করছে শিল্প ও শিল্পীর কাছে এক অনন্য মহিমায়। নিজের চিত্রকলা ছাড়া শিল্পের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় শাহীন একজন নির্মোহ কন্ট্রিবিউটর। তাকে নিয়ে অনেক বলার আছে, কিন্তু তা এক্ষুণি নয়। আরও কিছু বসন্ত আসুক।

পঞ্চাশ বসন্তে আমার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রিয় বন্ধুকে।

*আলফ্রেড খোকন- কবি*

# শিল্পী শাহীনুর রহমান : আগামীতে

## হাসান শাহরিয়ার

২০০৬ সালে 'থিয়েটারওয়ালা'র ১৮তম সংখ্যাটি যখন 'সৌজন্য সংখ্যা' হিসেবে বিতরণের জন্য ফেরি করছি, তখন অনেকে, কিংবা প্রায় সবাই, এমনকি যারা ততক্ষণে বা ততদিনে বুকস্টল থেকে সংখ্যাটি কিনে অন্তত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন, তারা বললেন—'বাহ্! এবারের প্রচ্ছদটা খুব সুন্দর হয়েছে। প্রকৃতশিল্পীর ছোঁয়া আছে এতে'। এবং এর প্রায় ১৩/১৪ বছর পর, আজ, মনে পড়ছে, তারপর থেকে থিয়েটারওয়ালা'র সব সংখ্যা ও আয়োজনের প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ আর নন্দনপ্রকাশের সাথে মিশে আছেন শিল্পী শাহীনুর রহমান।

'থিয়েটার আর্ট ইউনিট'-এর একযুগ পূর্তির একটা লেখা জমা দিতে গিয়ে তার সাথে প্রথম দেখা। থিয়েটারবন্ধু প্রশান্ত হালদার তাকে পরিচয় করিয়ে দিলো দলের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে। ঐ দলের 'সক্রিয়' সদস্য অথচ আমার সাথে পরিচয় নেই—ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছিল না। কেননা থিয়েটার আর্ট ইউনিটের সবার সাথে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। পরে জানলাম উনি একজন চিত্রশিল্পী, যাকে বলে কিনা নিখাদ আর্টিস্ট। আরো জানলাম, উনি নিভৃতচারী, 'কথা কম, কাজ বেশি' করা মানুষ। আমাদের মতো হুদাই ফাল পাড়েন না। ওনার 'খাজনা' অনেক, 'বাজনা' বাজে না বললেই চলে।

বসতে দিলে খাইতে চায়, খাইতে দিলে শুইতে চায়—এ-ই আমাদের ধর্ম। আমিও তাই 'ধর্ম পালনের স্বার্থে' প্রথমে থিয়েটারওয়ালা'র প্রচ্ছদ, এবং অতঃপর, মুখোমুখি-আড্ডা-নাট্যযজ্ঞের পোস্টার ডিজাইন, 'রঙ্গমাতন সোলায়মান মেলা'র সার্বিক সাজসজ্জা, ইন্সটলেশন, এমনকি 'থিয়েটারওয়ালা রেপাটরি' প্রযোজনা 'শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্টস'-এর সেট ডিজাইনও করিয়ে নিলাম তাকে দিয়ে। থিয়েটার এরেনায় শাহীনুর রহমানের শিল্পছোঁয়া পেয়ে উদ্বেলিত হলাম।

এ সবই খুশির খবর। কিন্তু ইতোমধ্যেই একটা সংকটও যেন দেখতে পেলাম!

থাক, সংকটের কথা এখনই না বলে আরও কিছু খুশির খবর বলে নিই আগে।

একে একে লক্ষ করলাম, 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট' ও 'থিয়েটারওয়ালা'র সব ডিজাইনের সাথে তো বটেই, শাহীনুর রহমানের বিচরণ শুরু হয়ে গেছে আরও অনেক অনেক নাট্যদলের সাথে। যার যখনই উৎসব হয়, নতুন নাটক মঞ্চে নামে, ছুটে আসে শাহীনুর রহমানের কাছে। থিয়েটার এরেনা ছাড়াও আরো অনেক লিটলম্যাগ আর বন্ধুবান্ধবদের কবিতা-গল্প-উপন্যাসের প্রচ্ছদ আঁকা নিয়ে তাকে থাকতে হচ্ছে ব্যস্ত। নাটক, সাহিত্য সব ক্ষেত্রই ঋদ্ধ হয়ে চলেছে ওনার শিল্পস্পর্শে!



সংকটটা ঠিক তখনই পরিষ্কার হলো।

শাহীনুর রহমান আসলে করেনটা কী? উল্লিখিত কাজগুলো তো আছেই, তার বাইরেও যদি দৃষ্টি দিই, দেখতে পাই, উনি অফিসে বসে এনজিও-র ম্যাগাজিনের ফরমায়েশি ডিজাইন করছেন, ছাপিয়ে দিচ্ছেন। রাতদিন খেটে বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করছেন। অফিসে বসে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন, নানান বিল-ভাউচারে সই করে দিচ্ছেন। এ যেনো এক কর্পোরেট জীবন যাপন করে চলেছেন শাহীনুর রহমান।

কিন্তু শাহীনুর রহমানের আসল সত্তা কী? সবকিছুর উর্ধে উনি হচ্ছেন 'শিল্পী'—আর্টিস্ট। অথচ 'শিল্পী'র কোনো 'সৃষ্টি' তো কোথাও চোখে পড়ছে না। আমার সাথে পরিচয়ের পর যদ্দূর মনে পড়ে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত 'জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী'-তে

বেঙ্গল ফাউন্ডেশন প্রদত্ত 'বেস্ট মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিলেন। এছাড়া কয়েকবার 'এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল'-এ অংশ নিয়েছিলেন। এবং ওখানে তিনি মূলত ইন্সটলেশনের কাজ করেছিলেন, যা-ও কিনা তার মূল সত্তা না। এর বাইরে তার কোনো আর্ট এক্সিবিশন তো দূরের কথা, নিয়মিত আঁকাআঁকিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এমন খবরও পাইনি। বহুবার বহুজন তার সাথে এ নিয়ে কথা বলেছে। এমত পীড়াপীড়িতেই, হয়তোবা, এক সময় ইস্কাটনের একটা চিলেকোঠায় বন্ধু আলফ্রেড খোকনকে সাথে নিয়ে কিছুদিন নিজেকে আঁকাআঁকিতে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন তিনি থিতু হয়ে বসতে পারছেন না।

এর কারণ যাই হোক, করণীয় কী?

ওনাকে আমরা 'শিল্পী' হিসেবে, একজন কড়া লাইনের 'আর্টিস্ট' হিসেবে দেখতে চাই। রবীন্দ্রনাথ যতই ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক লেখেন না কেন, এমনকি তিনি যত বড়মাপের সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রশিল্পীই হোন না কেন–শেষঅব্দি তিনি 'কবিগুরু', 'কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস বাংলাসাহিত্যের গর্ব হলেও তিনি 'কবি জীবনানন্দ দাশ'। আরো কাছের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়–বন্ধু আলফ্রেড খোকন যতই সফল-গদ্য লিখুক কিংবা ছবি আঁকুক অথবা মিডিয়ায় চমৎকার চমৎকার প্রোগ্রাম তৈরি করুক না কেন, আসল পরিচয় সে 'কবি'–'কবি আলফ্রেড খোকন'। বন্ধু নজরুল কবীর যতই প্রবন্ধ লিখুক কিংবা সাহিত্যচর্চা করুক না কেন, সে মূলত 'সাংবাদিক'–'সাংবাদিক নজরুল কবীর'। এবং আমরা, মানে থিয়েটারওয়ালা'রা টিভি-চলচ্চিত্র মিডিয়ায় যতই নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালকের ভূমিকায় জনপ্রিয়তা পাই না কেন–আমাদের প্রধানপরিচয় শেষঅব্দি নাট্যকর্মী-নাট্যজন-মঞ্চশিল্পী। ঠিক তেমনি শাহীনুর রহমান যতই প্রচ্ছদশিল্পী কিংবা সেট ডিজাইনার বা কবি অথবা লেখক হোন না কেন–আমরা তাঁকে পেতে চাই 'শিল্পী শাহীনুর রহমান' হিসেবে। যেমনটা আমরা চট করেই উচ্চারণ করি–'শিল্পী জয়নুল আবেদিন' কিংবা 'শিল্পী শাহাবুদ্দিন'–ইত্যাদি।

কিন্তু শাহীনুর রহমানকে তার শিল্পচর্চায় আবার নিয়মিত করবো কীভাবে?

আমরা যারা তার নিকটজন, তারা লক্ষ করে থাকবো, সমাজ-রাজনীতি-দেশ-বিশ্ব-অর্থনীতি-প্রকৃতি-হাসি-কান্না সব বিষয়েই শাহীনুর রহমান সচেতন-সতর্ক-আনন্দিত-বিচলিত। তার সমস্ত সত্তাজুড়ে আছে সৃষ্টির উন্মাদনা। প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে তার শিল্পমস্তিষ্ক, অথচ কিছুই পয়দা করতে পারছেন না তিনি। কী এক অস্থিরতা যেন ভর করে আছে তার সমস্ত অস্তিত্বজুড়ে। এই অস্থিরতা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য প্রয়োজন একদল 'ভূমেন্দ্র গুহ'।

হ্যাঁ, ভূমেন্দ্র গুহ যেমন ট্রাঙ্কে আটকেপড়া গল্প-উপন্যাস উদ্ধার করে জীবনানন্দকে নতুন রূপে



হাজির করেছেন, ঠিক তেমনি শাহীনুর রহমানের 'করোটি নামক ট্রাঙ্ক' থেকে উদ্ধার করতে হবে তার সৃষ্টিঅপেক্ষারত চিত্রকলা। আমরা যারা তার বন্ধু হিসেবে, 'ভূমেন্দ্র গুহ' হিসেবে, বিচরণ করছি তার চারপাশে, তাদের কাজ হবে শাহীনুর রহমানের ট্রাঙ্কে লুক্কায়িত-অপ্রকাশিত-অপ্রদর্শিত-সৃষ্টিঅপেক্ষারত চিত্রকলাগুলোকে ক্যানভাসে রূপ দেয়া। কেবল 'পঞ্চাশ বসন্তে' উদ্‌যাপন করেই যেন আমাদের দায়িত্ব শেষ না হয়।

প্রয়োজনে তাকে তার ব্যবসায়িক কাজ থেকেও রেহাই দেয়া যায় কিনা। অফিসের প্রতিদিনকার জমা-খরচ, ফরমায়েশি কাজের বকেয়া বিলের হিসাব নেয়া, পেটের দায় মেটানো কাজের সন্ধানে এনজিও অফিসে ধরণা দেয়া থেকে তাকে মুক্তি দেয়া যায় কিনা। এমন সম্ভব কিনা যে, তিনি বাড়িতে বসে আলস্য উপভোগ করবেন, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে খামাখাই বাদাম চিবোবেন, একা নির্জনে কিংবা বন্ধুপরিবেষ্টিত হয়ে সিগারেট-সুরা নিঃশেষ করবেন এবং হঠাৎ করোটিতে তাড়না অনুভব করলে রঙ-তুলি নিয়ে ক্যানভাস রাঙাবেন। এভাবেই কাটুক না আমাদের প্রিয় শিল্পীর বাকিটা জীবন। সেই ব্যবস্থা কিংবা পরিবেশ কি আমরা করে দিতে পারি না?

জীবনানন্দ দাশ আর শাহীনুর রহমানের জীবনতো অনেকটা 'উল্টাপুরাণ'। কবি তার কবিসত্তা প্রকাশ করে গেছেন জীবদ্দশায়, মৃত্যুর পর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অন্যান্য সাহিত্যকর্ম। আর শাহীনুর রহমান সৃষ্টি করে চলেছেন যত্তসব 'বাইপ্রোডাক্ট' আর গোপনে করোটি-নামক-ট্রাঙ্কে রেখে যাচ্ছেন তার প্রকৃত শিল্পকর্ম। জীবনানন্দের ট্রাঙ্ক না ভাঙলেও তিনি 'কবি' হিসেবেই আমাদের মনন ঋদ্ধ করে যেতেন। কিন্তু শাহীনুর রহমানের জীবদ্দশায় 'ট্রাঙ্ক' না ভাঙলে যে তার আসল সত্তা রয়ে যাবে অনাবিষ্কৃত। বেঁচে থাকবে কেবলি তার শিল্পের কিছু 'বাইপ্রোডাক্ট', কিছু 'গার্বেজ'। এ থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। এবং আমাদেরও, তার অতিকাছের 'ভূমেন্দ্র গুহ'দেরও, মুক্তি পেতে হবে। উদ্ধার করতে হবে তার ট্রাঙ্কের সব মালমশলা। যদি এমনটা করা যায়, এবং তিনি 'শিল্পী শাহীনুর রহমান' হিসেবে আবারো মগ্ন হন তার সৃষ্টিতে, তখনই আমরা, তার 'পঞ্চাশ বসন্তে'র আয়োজকরা, সার্থক হবো, ধন্য হবো।

তখন, কোনো একদিন, শিল্পকলা একাডেমির কোনো এক কোণে, নির্জনে বসে থাকা একটা মানুষকে দূর থেকে দেখে নিশ্চয়ই বলতে পারবো–ঐ তো বসে আছেন 'শিল্পী শাহীনুর রহমান'–আমি তার বন্ধু। আমরা তার বন্ধু।

*হাসান শাহরিয়ার- সম্পাদক, থিয়েটারওয়ালা*

# শাহীনুর রহমান এক প্রতিভা

## ফাহমিদুল হক

শাহীনুর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রাজীব নূরের মাধ্যমে। এঁরা দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র। শিক্ষাজীবনে এঁরা আমার দুই বছর সিনিয়র, রাজীব ভাই বাংলার, শাহীন ভাই চারুকলার। শাহীন ভাই চারুকলার সেরা ছাত্র ছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে পারেননি। কথাগুলো রাজীব ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা। আমার শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা তাদের আরেক বন্ধু হলেন কবি জাফর আহমদ রাশেদ। রাজীব ভাইয়ের সূত্রে আমি এঁদের কাছাকাছি চলে আসি। তবে রাজীব নূরের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল, মনে নেই। সম্ভবত তরুণ সরকারের সূত্রে। ২০০২-০৩ সালে আমরা তিনজন–আমি রাজীব নূর, শাহীনুর রহমান–একসঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গিয়েছিলাম সেতারবাদক ওস্তাদ আফজালুর রহমানের বাসায়। সেখানে আমরা তাঁকে ইন্টারভিউ করি। শাহীন ভাই রেকর্ড করেন, ছবি তোলেন। তাঁর হাতে তখন আধুনিক এক ডিজিটাল ক্যামেরা। ডিজিটাল ফটোগ্রাফি জিনিসটা একেবারে নতুন তখন, ফটোগ্রাফারদের অনেকে একে গ্রহণ করতে অনীহ–এসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওস্তাদ আফজালুর রহমানকে ইন্টারভিউ করার কারণ হলো, এই সেতারবাদক তখন জীবনসায়াহ্নে। তিনি ছিলেন অন্ধ সংগীতকার। তাঁকে ঢাকায় এনে সংবর্ধনা দেবার উদ্যোগ নিয়েছেন রাজীব নূর। তারই অংশ এই ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউসহ ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকা বের হয়, আমি তার সম্পাদনা করি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে-আসতে শাহীনুর রহমানের সঙ্গে আন্তরিকতা জমে ওঠে। পরে তাঁর অফিসে আরো যাওয়া হয়, এমনকি বাসায়ও। পল্লবী ভাবীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তিনিও চিত্রকর।

রাজীব নূরের মাধ্যমে পরিচয় হলেও, শাহীনুর রহমানের কাজের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল। বিশেষ করে কামরুল হুদা পথিক সম্পাদিত লিটল ম্যাগ 'দ্রষ্টব্য'র কাভারগুলো আমার এত ভালো লাগতো, জানতে ইচ্ছে করতো, কে এই প্রচ্ছদকার? তো সেই প্রচ্ছদকারের সঙ্গে কেবল পরিচয়ই হলো না, আমার অনেক প্রকাশনার প্রচ্ছদকারও হয়ে উঠলেন তিনি। শাহীনুর রহমানের নিশ্চয়ই শৈল্পিক কাজের নিজস্বতা রয়েছে, কিন্তু তার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে ওঠেনি।

রাজীব নূরের একটা মহৎ গুণ আছে। তিনি অন্যের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসেন। তরুণ লেখক প্রকল্প থেকে আমার ছোটগল্পের বই বের হয় ১৯৯৭ সালে। সেটা ছিল একটা প্রকল্পের অংশ। প্রকল্পে চান্স পেয়েছি, সেখান থেকে বই বের হবেই। এরপর নিয়মিত গল্প লিখে চলেছি কিন্তু পরের বই করাটাই ছিল আসল চ্যালেঞ্জ। নতুন লেখকদের প্রকাশক পাওয়া সহজ কিছু ব্যাপার নয়। রাজীব নূর আমাকে নিয়ে চললেন বড় বড় প্রকাশকের কাছে–মাওলা, আগামী ইত্যাদি। অবশেষে আগামী থেকে আমার দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'এ শহর আমার নয়' বেরুলো ২০০৫ সালে। সে বইয়ের দারুণ এক প্রচ্ছদ করলেন শাহীনুর রহমান। বইমেলায় বইটি দেখে লেখক আনিসুল হক বলেছিলেন, এত সুন্দর প্রচ্ছদ কে করেছে?

বহুদিন ধরে আমরা একটা পত্রিকা করি, অ্যাকাডেমিক ধাঁচের, নাম 'যোগাযোগ'। প্রথম দিকে সব কাজ আমরাই করতাম, এমনকি প্রচ্ছদও। এক পর্যায়ে মনে হলো প্রচ্ছদটা অন্তত প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে করাই। শাহীন ভাইয়ের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলাম। পুরনো এক সংখ্যা দেখে বললেন, আপনাদের প্রচ্ছদের আইডিয়া ঠিক আছে, সৌন্দর্যের ঘাটতি আছে। ঠিক আছে আমি করবো। 'যোগাযোগ' পত্রিকার সংখ্যা ৭-এর প্রচ্ছদ করলেন তিনি। পত্রিকা পরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, পত্রিকার সঙ্গে শাহীন ভাইয়ের যুক্ততাও অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। রেপ্রিজেন্টেশন সংখ্যা, জনসংস্কৃতি সংখ্যা, টেলিভিশন সংখ্যা, নিউ মিডিয়া সংখ্যা–এগুলো সবই শাহীনুর রহমানের হাতের ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ হয়েছে। বলা ভালো এসব কাজের জন্য তিনি সম্মানী নিতেন না। বস্তুত এধরনের কাজ তিনি সম্মানী ছাড়াই করতেন। রবিউল করিমের পত্রিকা 'ব্যাস'-এর মুখচ্ছবিও তিনিই আঁকতেন। তাঁর এরকম বহু কাজ রয়েছে, সবকিছুর হদিস আমার জানা নেই। তার সম্মানী বা উপার্জন আসে তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'রেডলাইন' থেকে।

তিনি নাটকের দল 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের মঞ্চপরিকল্পনা ও সজ্জার কাজ তিনি করতেন। এখন তিনি নাটকের নতুন দল 'অনুস্বর'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি বইয়ের দোকান 'বাতিঘর'-এর সঙ্গেও যুক্ত। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট-এর বাতিঘর-এর চমৎকার ইন্টেরিয়র সুধীমহলে একটা বিশেষ আলোচ্য বিষয়। বিশেষত চট্টগ্রামের বাতিঘরে জাহাজের ইন্টেরিয়র, কিংবা ঢাকার বাতিঘর-এ কার্জন হল ও নবাবী ঐতিহ্য—শহরভিত্তিক এই থিম বইকেন্দ্রগুলোকে অনন্য করে রাখে। এইতো গত বইমেলাতেই বাতিঘর সেরা স্টলের পুরস্কার পেল। সেও তো শাহীনুর রহমানেরই 'শিল্প'।

শাহীন ভাইয়ের সঙ্গে আমার কাজের সম্পর্ক স্থায়ী হয়েছে। কিন্তু এমন নয় যে ব্যক্তিগত বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক খুব উদ্‌যাপিত হয়। একই কথা রাজীব ভাইয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। আমাদের নব্বই দশকের সেই সাহিত্যচর্চার সময় ছিল একটা, সেটা আর আগের রূপে নেই। রাজীব ভাই আর গল্প লেখেন না, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তাঁর অনেক নাম। আমি গল্প ছেড়ে প্রবন্ধকার-গবেষক হয়েছি। ফেসবুকে এঁদের সঙ্গে যুক্ততা আছে, কালেভদ্রে ঢাকা শহরের কোনো এক স্থানে দেখা হয়ে যায় আমাদের। কিন্তু দুই-এক বছরের ব্যবধানেও হঠাৎ ফোন করে যদি বলি, শাহীন ভাই, এটা করা লাগবে, তিনি এককথায় হাজির আছেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক একেবারে অটুট রয়েছে।

শাহীনুর রহমান এক প্রতিভা। তাঁর ৫০ বছর পূর্তিতে অনেক ভালোবাসা। তিনি শতবর্ষী হোন, এ-ই হলো আন্তরিক প্রত্যাশা।

*ফাহমিদুল হক- লেখক ও শিক্ষক*



## শাহীনুর রহমান : বিচরণে বৈচিত্র্য

**ফয়েজ জহির**

পরিচয়ের যোগসূত্র অনুসন্ধান! দিনক্ষণ মিলিয়ে হিসাব মিলানো একটু কঠিন। হতে পারে 'থিয়েটারওয়ালা' বা 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট', কিন্তু নাট্যকর্মী তারেকুল ইসলামের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নাই।

তারেকের এক কামরার চিলেকোঠার বাসায় গৃহত্যাগী আমার সাময়িক অবস্থান। অবশ্য সেই সাময়িক অবস্থানের পরিধি বেশ দীর্ঘ হয়েছিল। হয়েছিল বলেই থিয়েটারের গণ্ডি ছাড়িয়ে শিল্প সাহিত্যে নিরন্তর কর্মরত বেশ কজন মানুষের সাথে পরিচিত হবার ও সখ্য লাভের সুযোগ ঘটেছিল। তারেকের চিলেকোঠার বাসায় অনিয়মিত আড্ডায় অনিয়মিত উপস্থিত হতেন নজরুল কবীর, আহমাদ মোস্তফা কামাল, পারভেজ হোসেন, মোহাম্মদ বারী, হাসান শাহরিয়ার, সাইফ সুমন, রাজীব নূর এবং আলফ্রেড খোকন। অনিয়মিত আড্ডায় আরো অনিয়মিত উপস্থিত থাকতেন শাহীনুর রহমান। বিশেষ আকর্ষণ তারেকের সুস্বাদু রান্না।

জুলাই ২০০৭ কোনো এক সন্ধ্যায় 'এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল' (Asian Art Biennale) দেখতে দেখতে 'জিরো : দ্যা প্রাইমারি ইউনিট' স্থাপনা শিল্পের সামনে দাঁড়াই। শিল্পী শাহীনুর রহমানের স্থাপনাশিল্প। যে শিল্প বেঙ্গল ফাউন্ডেশান অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছিল। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন শাহীনুরের সাথে পরিচয় হতে থাকে।

শাহীনুর শিল্প চেতনায় বিমূর্ত ধারার বাহক। প্রকৃতি ও মানুষ এর সৌন্দর্য প্রকাশের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে মানুষের যাপিত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, অবনত করে মানবেতর জীবনের দিকে ঠেলে দেয়—শিল্পকর্মে তার স্বরূপ উন্মোচনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। যেখানে নিরন্তর মানবতা পিষ্ট হয় তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বারা, এবং ধর্মের অজুহাতে চোখে ঠুলি এঁটে যুক্তি ও চেতনা বিবর্জিত এক শ্রেণির মানুষ(?) রক্তের হোলি খেলায় মেতে ওঠে। শাসকরা কখনও কখনও তাদের পক্ষাবলম্বন করে।

শাহীনুরও তাই তার শিল্প প্রকাশে বিশেষ পক্ষাবলম্বন করেন। কারণ, নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। এহেন শাহীনুরের শিল্পকর্ম পরিধিতে সুনির্দিষ্ট কোনো মাধ্যমে থিতু হতে পারেন না। শিল্পের নানা বহুমুখী টানাপোড়েন তাকেও বহুমুখী করে তোলে। হয়ে ওঠেন নাটকের মানুষ। আমরা দেখতে পাই সেই তিনি হয়ে উঠেন মঞ্চ পরিকল্পক বা সেট ডিজাইনার। থিয়েটার আর্ট ইউনিটের আমিনা সুন্দরী নাটকের পটভূমি বিস্তারে সাম্পান তার উপজীব্য হয়ে ওঠে। সাম্পানের পাঁচটি খণ্ড নাটকের অভিনয়স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কম্পোজিশান তৈরি করে, তাতে ভিন্ন

ভিন্ন স্থান ও চিত্রকল্প নির্মাণের পরিভ্রমণ আমরা দেখতে পাই। আমাদের চোখে স্থান কাল বদলে যায় পলকে। আমরা তার সাথে পথ চলতে চলতে নাটকের চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌছে যাই। সেই পথ চলায় কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। থাকে না খানাখন্দ-গহ্বর। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই নাটকে আলোক পরিকল্পনা করার। সেই ধারাবাহিকতায় 'থিয়েটারওয়ালা রেপাটরি' প্রযোজনা শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্টস-এ আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই কীভাবে বহুজাতিক কোম্পানি তার উপর চড়াও হয়, পণ্যের বেচাকেনায় সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুও পণ্য হয়ে যায়।

২০১৯ সালে ভূমিষ্ঠ নতুন নাট্য সংগঠন 'অনুস্বর' এর নাটক অনুদ্ধারণীয় নাটকে শাহীনুরের বিমূর্ত মঞ্চপরিকল্পনা। এক মানুষের ভেতরে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মুখাবয়ব হয়ে ওঠে উপজীব্য। চারুকলার অভিজ্ঞতালব্ধ শাহীনুর রহমানের মঞ্চ পরিকল্পনা আমাদের থিয়েটারে শুধু অলঙ্কার হয়ে থাকে না, নতুন ভাষা তৈরি করে।

'আরণ্যক নাট্যদল'-এর ৪০ বছর পূর্তিতে যে স্থাপনাশিল্প নির্মাণ করেন, সেখানে নারীকে ধর্মের নামে এই বাংলার মাটি ও মানুষের সংস্কৃতি বিবর্জিত লেবাসে-শিকলে আবদ্ধ করে, কীভাবে এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঠেলে দেয়া হচ্ছে তার প্রকাশ দেখান। উৎসব চলাকালীন এক সকালে আমরা দেখতে পাই সেই শিল্পকর্ম আক্রান্ত। শিল্পকর্মের টুকরো টুকরো অংশ
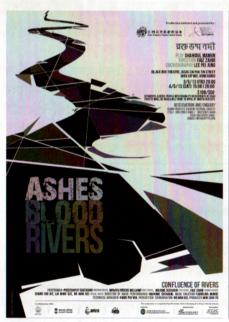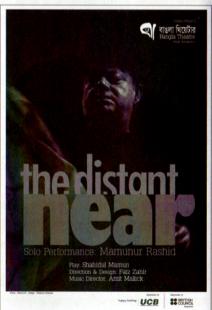
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চত্বরে পড়ে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্তির অন্বেষণে। আমরা ক্ষুব্ধ হই, কিন্তু শাহীনুর জানতেন এ আঘাত আসতেই পারে। তিনি সরব হন না। কিন্তু কর্মে ব্যাপ্ত থাকেন। এই ব্যাপ্ত থাকাই প্রতিবাদ।

প্রচারবিমুখ শাহীন শিল্পকলাকে বাজারজাত করার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেননি। বরং প্রচারবিমুখ মানুষটি নিভৃতচারী থেকে অলক্ষ্যে কাজ করে যান।

সাম্প্রতিক সময়ের একটি বিষয় না বললেই নয়। গত ৪ অক্টোবর ২০১৯ ছিল আমার নির্দেশিত কৈবর্তগাথা নাটকের প্রথম প্রদর্শনী। তার প্রায় দিন-বিশেক পূর্বে শাহীনুর ভাইকে ফোন করে দেখা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন আসুন... কিন্তু সাথে সাথে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন-কেন আসতে চাচ্ছেন? আমাকে উত্তর দিতেই হয়। কৈবর্তগাথা নাটকের ক্যালিওগ্রাফি (Calligraphy) ও পোস্টার ডিজাইন করার নিবেদন জানালাম। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন পারবেন না, ব্যস্ত আছেন। আমি খুব অনুরোধ না করে জানিয়েছিলাম, উনিই হচ্ছেন আমার প্রার্থিতজন, এই নির্দিষ্ট কাজটির জন্য। আমি জানি, কৈবর্তগাথা নাটকের পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু যদি ওনার জানা থাকতো তাহলে তিনি 'না' করতে পারতেন না। তাছাড়া অন্য পথও ছিল, সরাসরি চলে গিয়ে যদি ওনাকে চেপে ধরা যেত। কিন্তু আমি তা করিনি। করিনি সে আশা রেখেই যে, কোনো একদিন হয়তো তিনি প্রশ্ন করবেন, নতুন কি কাজ করছেন বা আমিই হয়তো পুনরায় কোনো নতুন কাজের কথা নিয়ে কথা বলবো। এভাবেই আগামীতে আমাদের পারস্পরিক কাজের ক্ষেত্রটি তৈরি হয়ে যাবে। যেভাবে অতীতে ঊর্ণাজাল নাটকের ক্যালিওগ্রাফি, পোস্টার এবং আরণ্যক নাট্যদলের চল্লিশ বছর নাট্য উৎসবের সকল প্রকাশনা ও উৎসব প্রাঙ্গণে অলঙ্করণ যুক্ত করে উৎসবে নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছিলেন।

লেখায় প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ই উঠে এলো। তারপরও কিছু কথা থেকে যায়। শাহীনুর রহমান সমকালীন ভাবনায়-সংকটে একজন শিল্পী। শিল্পী কিন্তু তথাকথিত সমাজবিমুখ নন, বরং অনেক বেশি লগ্ন। এই লগ্নতা সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্র-মানুষ-তাতে বিভিন্নমুখী প্রবণতার স্রোতধারা আর তার সাথে বিজ্ঞানমনস্কতা ও তার ঘূর্ণন, তাতে থৈ খুঁজে ফেরা মানুষ শাহীনুর রহমান। অস্থির সময়ের প্রবহমানতায় তিনি হয়তো সকল সময়ে স্থির অচঞ্চল থাকতে পারেন না, তবু তিনি সেই আবর্তে থেকেও দেখার বোঝার চোখ উন্মিলিত রাখেন সৃজনের জন্য। আর তার কর্মের মধ্য দিয়েই একজন শাহীনুর রহমান আমাদের সকলের মাঝে জাগরূক থাকেন। এভাবেই বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা সময়ের সাথে ব্যাপ্তি পায়।

*ফয়েজ জহির- নাট্যনির্দেশক ও ডিজাইনার*

# শাহীনের ঢাকায় আগমন ও থিয়েটারে প্রবেশ

প্রশান্ত হালদার

১৯৯৬ সালে, জুন মাসে, ধানমণ্ডি ৮ নম্বরের জার্মান কালচারাল সেন্টারের অডিটোরিয়ামে ফিল্ম মেকিং ট্রেনিং কোর্সের প্রথম ক্লাস। ক্লাস চলছে। একজন শিক্ষার্থী বিলম্বে ঢুকলো ক্লাসে, মাথায় লম্বা চুল ও ক্যাপ। গেট-আপটাই একটু অন্যরকম, একটু অন্য ধাঁচের, বেশ ব্যতিক্রমী। ঢুকে বসলো পেছন দিককার একটি সারিতে আমার কিছুটা কাছাকাছিই, যদিও সামনের দিকে কিছু আসন খালি ছিল। ক্লাসে লেকচার শুনছি আর ফাঁকে ফাঁকে আধা-মনোযোগে দেখছি ছেলেটাকে। আমার একেবারে পাশেই বসা ছিল আমার নাটকের বন্ধু হেলিন হাসান। সে তখন 'নাট্যকেন্দ্র'-এ কাজ করতো। তো আমি হেলিনকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ছেলেটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করালাম। হেলিন আমার গুঁতোর মর্ম বুঝতে পারলো, একটু হাসলো। আমিও মনে মনে একটু ঠোঁট উল্টেছিলাম–মানেটা এরকম যে, 'কত দেখলাম!' একটা বয়স থাকে–যে বয়সে কাউকেই যোগ্য মনে হয় না। না কোনো বন্ধুকে, না কোনো শিক্ষককে, না কোনো অন্য কাউকে–তেমনি আর কী!

মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে 'বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম'-এর আয়োজনে ও ব্যবস্থাপনায় ৩ মাসব্যাপী এই ফিল্ম মেকিং কোর্সের ক্লাস হতো জার্মান কালচারাল সেন্টারে, আর অধিকাংশ ফিল্মগুলো দেখানো হতো ধানমণ্ডি ২ নম্বর রোডের ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে। তাত্ত্বিক ক্লাসে বা ফিল্ম প্রদর্শনীর দিনগুলোতে ঐ ছেলেটিকে দেখেছি বহুবার, যদিও আমার সাথে কথা হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। একা আসতো, বসতো, ক্লাস করতো, ফিল্ম দেখতো, নোট নিতো, চলে যেত। অন্য কারো সাথেও খুব একটা কথা বলতে দেখিনি বোধহয়। খুব চুপচাপ। গম্ভীর।... এই ছেলেটাই শাহীন। শাহীনুর রহমান। শিল্পী শাহীনুর রহমান। নাটকের শাহীনুর রহমান। আমাদের শাহীন।

আমিও কিন্তু তখন স্বভাবে অনেকটাই শাহীনের মতন, মানে নিজে থেকে কারো সাথে মিশতে পারি না, বন্ধুত্ব করতে পারি না। ভাগ্যিস, এই কোর্সে আমার সাথে হেলিন ছিল–না হলে আমার অবস্থাও বোধকরি শাহীনের মতোই হতো। পুরো কোর্সে নতুন কারো সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়নি। কারো কারো সাথে টুকটাক কথাবার্তা হয়েছে, কখনো কুশল বিনিময় হয়েছে–এ পর্যন্তই। শাহীনকেও বোধহয় কখনো দেখিনি ক্লাসে কোনো প্রশ্ন করতে। অথচ অনেক ছেলেমেয়েরা কত হৈচৈ করেছে, কত আড্ডা জমিয়েছে, ক্লাসে কত সরব থেকেছে!

তিন মাসের মাথায় ১০০ মার্কের পরীক্ষা হলো আমাদের, লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে এখান থেকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য ১০ জনকে (ফিচার ফিল্মে ৫ জন, ডকু ফিল্মে



৫ জন) নির্বাচন করা হয়, সেই ১০ জনের মধ্যে আমি ছিলাম, শাহীনও ছিল। তখন ওর সাথে বেশ কদিন কথা হয়েছে, অল্প-স্বল্প–এই যা।

শাহীন ঢাকায় এসেছে ১৯৯৬-তে। তার আগে ও থাকতো চট্টগ্রাম–চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে পড়তে গিয়েছিল ১৯৮৮ সালে, যদিও কোনোদিন হলে থাকেনি। এর আগে এসএসসি-এইচএসসি করেছে খুলনাতে। পৈতৃক নিবাস নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে হলেও বাবার চাকরিসূত্রে পরবর্তীতে খুলনাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে 'পেইন্টিং'-এ অনার্স, আর 'প্রিন্ট মেকিং'-এ মাস্টার্স। পেইন্টিং সে খুব এনজয় করতো, কিন্তু হঠাৎ করে প্রিন্ট মেকিং ভীষণভাবে টানলো ওকে–তাই মাস্টার্সে প্রিন্ট মেকিং নিয়ে পড়া। অনার্সে ফার্স্টক্লাস থাকলেও শিক্ষকের সাথে ঝামেলার কারণে মাস্টার্সে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স কোনোটারই সার্টিফিকেট ওঠায়নি শাহীন। ক্ষোভ? রাগ? দুঃখ? জেদ?...

চারুকলা ডিপার্টমেন্টের দুই বছরের জুনিয়র পেইন্টিংয়ে অধ্যয়নরত সাবিরা জাহান পল্লবী'র সাথে প্রেম হয়, এবং তারপর বিয়ে। পল্লবী ফরিদপুরের মেয়ে। দুটো ছেলে সন্তান ওদের।

পেশায় ব্যবসায়ী হলেও শাহীন ধরনে-আচরণে ভালো ব্যবসায়ী না। ১৯৯৬ সালে ঢাকায় এসে কিছু করে খাওয়ার চেষ্টা... চারুকলা ডিপার্টমেন্টের খুবই জানি দোসত্ মিজানুর রহমান লিটনের সাথে দুজনে মিলে কাজ শুরু করে। রব সনস্-এ গিয়ে শাহীন ডিজাইন করিয়ে নিত, আর লিটন দেখতো মার্কেটিং। এরপর একসময় দুই বন্ধু মিলে অফিস দিলো, নাম–'ডিঙ্গা ডিজাইন স্টুডিও'। দেশে তখন কম্পিউটারাইজড গ্রাফিক্স চালু হয়েছে, এবং দিনদিন তা জনপ্রিয় হচ্ছে, চাহিদা বাড়ছে। তো হঠাৎ লিটনের সাথে ভুল বোঝাবুঝি। এরপর পার্টনারশিপে 'সাইন এইড লি.'; একসময় সেটাও ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠান 'রেডলাইন'। সেই ১৯৯৬ সালে ঢাকায় এসে নানা পথ ঘুরে এখনো রেডলাইনেই থিতু আছে। এখানে কোনো পার্টনার নেই। নিজের স্টাইলেই চলে। অফিসে আসা-যাওয়া আর না-আসা নিয়ে অসীম স্বাধীনতা! অফিসের কাজ ছাড়াও করে দিতে হয় বন্ধুদের নানা কাজ–বইয়ের প্রচ্ছদ, এটা ওটা ডিজাইন-প্রিন্টিং, স্যুভেনির, নাটকের পোস্টার-ব্রোশিওর–কত কী! অর্থের বিনিময়ে নয়, স্রেফ ভালোবাসা থেকেই।

শাহীন স্বভাবে বেশ জেদি, গম্ভীর, অস্থিরও–খুব অস্থির। কিন্তু দেখে মনে হবে বেশ শান্তই। কাজের সময় সারাক্ষণ প্রায় মিউজিক শোনে। ও ঘেঁটে ঘেঁটে বের করে অপ্রচলিত সব মিউজিক পিস। প্রফেশনাল কবি নয়–অনেক দিন পরপর হুটহাট কবিতা লেখে– হারিয়ে ফেলে, ঝোঁক এসে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ড্রইং করে চলে–সেটাও হারিয়ে ফেলে। কোনো কিছু হারিয়ে ফেলা ওর অভ্যাস।

শাহীন বই প্রকাশনার সাথেও জড়িত। তবে অনিয়মিত। এই অনিয়মিতিই তার এই প্রকাশনা

সংস্থার মূল বৈশিষ্ট্য বলা চলে। কারো পাণ্ডুলিপি পছন্দ হলে বা আগ্রহ বোধ করলে বা ইচ্ছা হলে সেই বই সে প্রকাশ করে থাকে। থিয়েটারের মানুষদের নিয়ে লেখা আমার প্রথম উপন্যাস 'স্টুপিড কতিপয়' ও-ই প্রথম প্রকাশ করেছিল ওর 'জ্যাঁ পাবলিকেশন্স' থেকে।

ঢাকায় এসে নাটকের দলের সাথে যুক্ত হয়েছে শাহীন। ঐ যে ফিল্ম মেকিং কোর্স-তারপর শাহীনের সাথে দেখা হতো হঠাৎ হঠাৎ। বাংলা একাডেমিতে আসতো মাঝে মাঝে। তখন আমরা এখানে 'তরুণ লেখক প্রকল্প'-এর সাথে যুক্ত। 'ও আসতো বাংলা একাডেমিতে-আমার কাছে না, আসতো গল্পকার রাজীব নূর, কবি জাফর আহমদ রাশেদ-এদের সাথে দেখা করতে। এরা ওর চট্টগ্রামের বন্ধু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়কার বন্ধু। ঐ সময়ের চট্টগ্রামের আরও কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে ওর-কথা সাহিত্যিক রোকন রহমান, কবি হাফিজ রশীদ খান, কবি ভাগ্যধন বড়ুয়া...

তারপর মাঝখানে শাহীনের সাথে আর যোগাযোগ নেই। আমি তখন নাটকের দল 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট'-এ কাজ করি। তখন থিয়েটার নিয়েই আমার একমাত্র ব্যস্ততা। তো আমাদের তৃতীয় প্রযোজনা গোলাপজান নাটকের মহড়া চলছে তখন। দলের আরেক সদস্য তারেকুল ইসলাম (তারেক) একদিন গোলাপজান-এর একটা পোস্টার করিয়ে দলে এনেছে। নাটকটির নির্দেশক সোলায়মান ভাই (এস এম সোলায়মান) খুব পছন্দ করলেন তা, আমাদেরও খুব
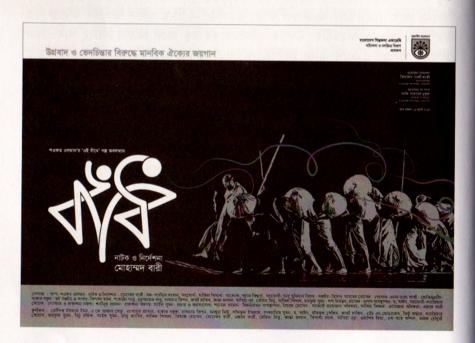
পছন্দ হলো। পরে কথায় কথায় জানা গেল পোস্টার ডিজাইন করেছে শাহীন নামের একটি ছেলে। এরপর উদ্ধার করা গেল এই শাহীন-সেই শাহীন। এরপর আরো দু-একটা পোস্টার ডিজাইন, তারপর একসময় থিয়েটার আর্ট ইউনিটে দলভুক্ত হয়ে গেল শাহীন। এভাবেই থিয়েটারের সাথে ওর সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়া। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনও সে কখনো থিয়েটারে কাজ করেনি। থিয়েটারে জড়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল না কখনো। তবে সেখানকার-মানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলার শিক্ষক ও প্রখ্যাত নির্দেশক কামালউদ্দিন নীলু'র একটি নাটকের দল ছিল-'বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার', সেখানে দু-একজন বন্ধু ছিল শাহীনের, তাই মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে মহড়ার আগে-পরে আড্ডা দিত শাহীন-এই আর কী।

শাহীন এ পর্যন্ত থিয়েটার আর্ট ইউনিটেই কাজ করেছে বেশি। এখানে সে আরো পোস্টার ডিজাইন করেছে- কাল সকালে, তৃণপর্ণে শালমঞ্জরি, সময়ের প্রয়োজনে, মগজ সমাচার, শেষের কবিতা, না-মানুষি জমিন ও মর্ষকাম নাটকে। অনুস্বর নাটকের দলের অনুদ্ধারণীয় নাটকের পোস্টার ডিজাইনও করেছে শাহীন, করেছে থিয়েটারওয়ালা রেপার্টরি'র শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্টস নাটকের পোস্টার। এছাড়াও নাটবাঙলা'র রিজওয়ান, পালাকার এর বাংলার মাটি বাংলার জল, বাঙলা থিয়েটার এর দ্য ডিসট্যান্ট নিয়ার, থিয়েটার '৫২ এর ননপুরের মেলায় একজন কমলাসুন্দরী ও একটি বাঘ আসে নাটকসমূহের পোস্টার ডিজাইনও তার। তাছাড়া নাট্যোৎসব বা নাট্যমেলার নানা পোস্টার তো আছেই।

নাটকের পাড়ায় সেট (মঞ্চসজ্জা) ডিজাইনার হিসেবে শাহীনুর রহমান এক অপরিহার্য নাম এখন। এরই মধ্যে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ করে ফেলেছে। থিয়েটার আর্ট ইউনিট-এ সেট ডিজাইন করেছে-আমিনা সুন্দরী, শেষের কবিতা, না-মানুষি জমিন, মর্ষকাম, অনুদ্ধারণীয় নাটকে। অনুস্বর-এ অনুদ্ধারণীয় নাটকে, থিয়েটারওয়ালা রেপার্টরি'তে শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্টস, প্রাঙ্গণেমোর-এ ঈর্ষা, এবং প্রাচ্যনাট-এ পুলসিরাত নাটকেও। এর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত কারণে ঈর্ষা ও অনুদ্ধারণীয়; এবং শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্টস ও পুলসিরাত- দুই বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।

থিয়েটার আর্ট ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমি, শাহীন যুক্ত হয়েছিল কবছর পর। ওখানে দীর্ঘদিন আমরা কাজ করেছি একসঙ্গে। সম্প্রতি সেখান থেকে আমি ও শাহীন-সহ কজন বন্ধু বেরিয়ে এসে নাট্যজন মোহাম্মদ বারীর নেতৃত্বে 'অনুস্বর' নামে নতুন নাটকের দল প্রতিষ্ঠা করেছি। শাহীন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং নির্বাহী পরিষদেরও একজন। আমিও। যে ছেলেটিকে প্রথমদিনের দর্শনে ঠোঁট উল্টেছিলাম-দিনেদিনে সে-ই আজ পরম বন্ধু আর সহকর্মী। কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেলাম তার সাথে!

*প্রশান্ত হালদার- অভিনেতা ও লেখক*

# নাটকের মানুষ শাহীনুর রহমান : মার্জিন মন্তব্য

মোহাম্মদ বারী

এক ঘোড়া দিয়ে তার সাথে পরিচয়। উর্ধ্বমুখী এক ঘোড়া। পৃথিবীর সকল শক্তি একা সঞ্চয় করে এমন এক উর্ধ্বশ্বাসী ঘোড়া, যেন আকাশ ফুঁড়ে সে বেরিয়ে যাবে ওপারের আকাশে। আকাশের ওপারে আকাশে। আহা, সে যেন সোলায়মানের গোলাপজান।

বিষয়টি ছিল থিয়েটার আর্ট ইউনিটের নাটক গোলাপজান এর পোস্টার। দলের সদস্য তারেকের প্রস্তাব গোলাপজান নাটকের পোস্টারের ডিজাইনটি হোক শাহীনুর রহমানের হাতে। আমার সাথে তার পরিচয় নেই। দলের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে শিল্পীর সাথে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ হলো আমার। তারেক আমাকে নিয়ে গেল ফকিরাপুলের এক গলির ভেতরে শাহীনের অফিসে। অফিস মানে প্রিন্টিং হাউস–ডিঙ্গা। ঝাঁকড়া চুলের সুদর্শন তরুণটির অবিন্যস্ত অফিসের চেয়েও বেশি আকর্ষণ করলো শাহীনের স্বপ্নাতুর দুটি চোখ। স্বপ্নময় দ্যুতি আর ভালোবাসায় পূর্ণ দুটি চোখ। আমাদের এমনভাবে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটল যেন শাহীনের সাথে আমার পরিচয় আজন্ম। শুরু হলো আমাদের শিল্পযাত্রা। সেই থেকে আজ অব্দি আমরা হাঁটছি পাশাপাশি, প্রায় একুশ বছর।

শাহীনের মূল অঙ্গন চারুশিল্প। আমার থিয়েটার। থিয়েটারে যৌথতা খুব দরকারি। চারুশিল্প একাকী। একাকিত্ব তার মূলসত্ত্বা। শাহীনের এই একাকিত্বই বুঝিবা মহিমান্বিত হয়েছে তার সকল শিল্পকর্মে। শিল্পীর নিঃসঙ্গতার চেয়ে বড় মহিমা আর কী হতে পারে। শাহীনের একাকিত্বের অর্থ এই নয় যে শাহীনের বন্ধুবৃত্ত নেই। বরং শাহীনের মতো বন্ধুবৎসল মানুষ কমই হয়। শাহীন যথারীতি গৃহস্থ সংসারী, বাস্তব বিষয়ী এবং যাপিত জীবনে দস্তুর নাগরিক। তারপরও তার অন্তর্গত হওয়া যে কারো প্রায় দুঃসাধ্য। শাহীন কোথায় গিয়ে যেন একেবারে দুর্ভেদ্য হয়ে পরেন। এখানেই শাহীন একা এবং মহিমান্বিত। এখানেই শাহীন শিল্পী এবং আকাশ বা পাহাড়ের মতো বিরাট; অধিকাংশ শিল্পীর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য যেমন হয়ে থাকে। তাই একুশ বছর পেরিয়েও শাহীনকে চেনা বা বোঝা একটু দুরূহ বৈকি।

শাহীনুর রহমানকে চেনার সহজ উপায় তার কাজ–মানে শিল্পকর্ম। শাহীন আদতে যেহেতু চারুশিল্পী এবং আমি থিয়েটার কর্মী, তাই তার মূলকাজ আমার অনেক অচেনা। বরং চারুশিল্পের উপজাত হিসেবে শাহীন থিয়েটারে যে কাজগুলো গত বিশ/একুশ বছরে করেছেন তা দিয়ে শাহীনকে খানিকটা চেনা যায়। শুরুতে যেমনটা বলছিলাম গোলাপজান এর পোস্টারের কথা। আবু তাহেরের গোলাপজানের অশ্বারোহন গল্প থেকে এস এম সোলায়মানকৃত নাটক গোলাপজান এর কেন্দ্রীয় চরিত্রটির জীবন-সংগ্রাম এবং তার অপরাজেয়



পরিণতির যে আস্বাদ, তা যেন শাহীনের ঐ এক উর্ধ্বমুখী আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া অজেয় অশ্ব। এই অশ্বশক্তিকে ঠেকায় কে? নাটকের পাঠ যেন হয়ে যায় শুধুমাত্র এই পোস্টারটি দেখেই। নাটকের এমত নানা পোস্টার যেমন, সময়ের প্রয়োজনে, মগজ সমাচার, না-মানুষি জমিন, শেষের কবিতা, মর্ষকাম, বাঁধ, রিজওয়ান, শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্টস নিয়ে পাতার পর পাতা আলোচনা করা যায়। তবে এসব কাজের আলোচনা বিদগ্ধ চিত্রশিল্পীগণেরই করা উচিত। আমি বরং শাহীনুরের নাটকের সেট নির্মাণ বিষয়ে সামান্য মন্তব্য করতে চাই।

শাহীনের সেট নির্মাণের প্রথম কাজ আমার জানামতে 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট' এর 'আমিনা সুন্দরী' নাটকে। এ নাটকের সেট ডিজাইনে কী অসাধারণ কল্পনা শক্তিতে স্ফূটিত হয় নাটকের প্রধান চরিত্র আমিনা। পুরুষপীড়িত জীবনের ঘাটে ঘাটে বঞ্চনায় ছিন্ন-ভিন্ন সমুদ্র উপকূলের এক হার না মানা নারী আমিনা। সাম্পান তার জীবনের বাস্তব অনুষঙ্গ, একই সাথে তার বহমান জীবনের প্রতীক। এই নাটকের সেটে শাহীন ব্যবহার করলেন বিভিন্ন খণ্ডে নির্মিত সাম্পানের সাজেশন। পালাধর্মী এই নাটক উন্মুক্ত ঘরানার এবং যথেষ্ট ফ্লেক্সিবল। নির্দেশক মুন্সিয়ানার সাথে সেই সেটের বিভক্তি কাজে লাগালেন। একটি সাম্পান যখন বিভাজিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে নানা ধরনের ক্ষেত্র তৈরি করে, তখন পরোক্ষে আমিনার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়া জীবনের ছবিটিও যেন আর্তনাদ করে ওঠে। এক সাম্পানের সাজেশনের বহুধাবিভক্তি এবং তার সফল প্রয়োগের অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিচয় শাহীন দিয়েছিলেন নাটকের সেট নির্মাণের তার প্রথম কাজেই।

আবার 'থিয়েটারওয়ালা রেপাটরি' প্রযোজিত শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্টস নাটকে শাহীন সেট নির্মাণ করলেন; মুক্তবাজার অর্থনীতির সর্বগ্রাস যে নাটকের মূলভাষ্য, তার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগপৎভাবে নাটকের মূলক্ষেত্র ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট এবং মূল মঞ্চের সম্মুখের ফ্লোর জুড়ে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর ভোগবাদি প্রডাক্টসমূহের ইন্সটলেশন বা মঞ্চ পার্শ্বে সমকালীন বিপণন বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত বিলবোর্ড স্থাপনা। চমকে ওঠার মতো এমন কাজ ঢাকার মঞ্চে এটাই প্রথম। দর্শক বিস্ময়ে শুধু অভিভূতই হন না, এই সৃজনীরসে পূর্ণ অবগাহন করে পরিতৃপ্তও হন। 'প্রাঙ্গণেমোর' এর 'ঈর্ষা'য় বা সাম্প্রতিককালে 'থিয়েটার আর্ট ইউনিট' ও 'অনুস্বর' এর 'অনুদ্ধারণীয়' নাটকে ব্যাক প্রোজেকশনে আইকন চিত্র ও শিল্পকর্মের যথাযথ অনন্য ব্যবহার এবং নাটকের টেক্সটের অন্তর্গত ভিস্যুয়াল এমত ব্যাখ্যাও ঢাকার মঞ্চে নতুন এক অভিজ্ঞতা। থিয়েটার আর্ট ইউনিট প্রযোজনা 'না-মানুষি জমিন' এর এক টাওয়ার কিংবা 'মর্ষকাম' নাটকের বারকোডের সাজেশনে যে প্রতীক ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়, তাতে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে নাটকের সামগ্রিক ভাবরস। এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র নাট্যমঞ্চায়নে শিলং পাহাড়ের নৈসর্গিক মূর্তির ল্যান্ডস্কেপ সাজেশন কিংবা বাঁধ এর সামান্য ইংগিতপূর্ণ সেটের সাজেশনও কীরকম মাত্রা যুক্ত করে নাটকে, যারা এ নাটকগুলো দেখেছেন তারা অনুমান করবেন। 'প্রাচ্যনাট' এর 'পুলসিরাত' আমার এখনো দেখা হয়নি, তাই মন্তব্য করতে পারছি না। কিন্তু আমি নিশ্চিত শাহীনুর রহমানের বুদ্ধিদীপ্ত ছোঁয়া নাটকের সেটে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।
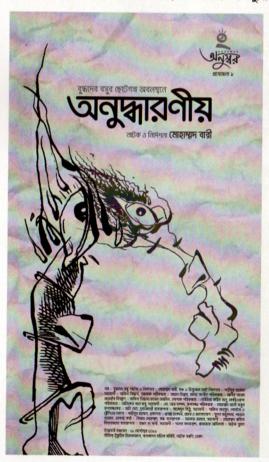
শিল্পী শাহীনুর রহমানের সহজাত শিল্পবোধে অধিবাস্তবতার তাড়না



যে-কেউ লক্ষ করবেন। তার পেইন্টিং-এ তা স্পষ্ট প্রতিভাত। নাটকের পোস্টার, মনোগ্রাম বা প্রচ্ছদ নকশায়ও লক্ষ করেছি শাহীনের এই অনুরাগ। কিন্তু সেট নির্মাণেও কোনো কোনো নাটকে তার এই স্যুরিয়েলিস্টিক প্রয়োগভাবনা আধুনিক নির্মাণগুলিতে যে মাত্রা যুক্ত করেছে তা নিঃসন্দেহে আমাদের নাটকের বড় প্রাপ্তি। এমনকি নাটকের উৎসব-প্রাঙ্গণ বা আড়ম্বর আয়োজনে ভিস্যুয়াল আর্ট ডিজাইনে শাহীন যে মাত্রা যোগ করেন, তা অভূতপূর্ব। যেমন 'থিয়েটারওয়ালা'র উদ্যোগে 'রঙ্গমাতন সোলায়মান মেলা'র প্রথম আয়োজনে এস এম সোলায়মানের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য এবং তারুণ্য-তাড়না মাথায় রেখে যে বিশাল গজাল বা পেরেকের ইন্সটলেশন করেছিলেন, তা যেমন দৃষ্টিনন্দন অন্তর[illegible], তেমনি শাখের করাতের মতো চেতনায় দ্রোহের দ্যোতনা দেয়। কী যেন কেটে কেটে যায় অন্তরে অন্তরে। 'রঙ্গমাতন সোলায়মান মেলা'র সম্ভবত তৃতীয় আয়োজনে শাহীন বড় বড় টিনের ড্রাম দিয়ে এক অভিনব বহিরঙ্গ সজ্জা করেছিলেন। একেবারে অরূপান্তরিত (raw) খাঁটি এক অনুভব তৈরি করেছিল সে ইন্সটলেশন। লক্ষ করেছি শাহীনের ইন্সটলেশনের কাজে মুক্তভ্রমণের একটা ইচ্ছা কাজ করে এবং পরাবাস্তবতার রূপে সেটা এমনই আধুনিক ও নান্দনিক হয়ে ওঠে যে, যেকোনো শিল্পরসিকই তা গ্রাহ্য করতে বাধ্য হন। এটা শাহীনুর রহমানের শিল্পকর্মের শক্তি।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, শাহীনের সাথে আমাদের, মানে নাটকের মানুষদের পরিচয় না ঘটলে নাটকের এ সকল কর্মকাণ্ডে তাকে হয়তো আমরা পেতাম না। শাহীন অন্তর্মুখে নিমগ্ন মানুষ। শুনেছি তার চারুকলার শিক্ষক হওয়ার কথা ছিল। তা না হওয়ায় নকশার কাজ বেছে নিলেন। অভিমানে ছবি আঁকা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য বা 'দুর্ভাগ্য'ক্রমে আমরা মানে নাটকের মানুষেরা জড়িয়ে পড়লাম তার সাথে। শাহীনও হয়ে উঠলেন নাটকের মানুষ। নাটকের এইসব কাজ না করলে শাহীন হয়তো ছবি আঁকতেন আরো, হয়তো আরো মগ্ন থাকতেন তার আদত শিল্পভুবনে। তাতে তার শিল্পভুবন কীভাবে ছড়াতো কে জানে। কিন্তু নাটকের এসকল অবিমিশ্র এবং স্বল্পায়ুর কাজ তার শিল্পভুবনে নিশ্চয়ই ভিন্ন রঙের রেখা টেনেছে। আমার বিশ্বাস তাতে তার ভুবন আরো বৈচিত্র্যময় ও রঙীন হয়েছে। রঙের মানুষ শাহীনের রঙ্গময় জীবনের পঞ্চাশ বসন্ত এখন। বাকী জীবন আরো রঙ্গময় হোক। আরো আরো আরো আলোছড়ানো শাহীন আমাদের নাটকের মানুষ হয়েই থাকুন বাকী জীবন। ভালোবাসা, শাহীন।

*মোহাম্মদ বারী- অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক*

# পঞ্চাশ বসন্তে শিল্পী শাহীনুর রহমান

[১৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০১৯। শিল্পী শাহীনুর রহমানের ৫০তম জন্মবার্ষিকী। এটিকে উপলক্ষ করে তার বন্ধুসকল, যারা সাহিত্য-চিত্রকলা-টিভি মিডিয়া-চলচ্চিত্র-সাংবাদিকতা-থিয়েটারে জড়িয়ে আছে নানাভাবে, উদ্‌যাপন করছে 'পঞ্চাশ বসন্তে'। ৮ নভেম্বর তার সৃষ্ট চিত্রকলা-নাটকের পোস্টার-প্রচ্ছদ-সেট ডিজাইন (মঞ্চনাটক)-গ্রন্থ উন্মোচন-আড্ডা-বৈঠক আর ডিজাইনকৃত নাটকের প্রদর্শনী নিয়ে সাজানো হয়েছে দিনব্যাপী এই উদ্‌যাপন পর্ব। শাহীনুর রহমানের ৫০ পূর্তিতে ছোট্ট একটি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়েছিল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন—মোহাম্মদ বারী, সেলিম মোজাহার, আলফ্রেড খোকন, তরুণ সরকার ও রাজীব নূর। তাদের মধ্যে মোহাম্মদ বারী ছাড়া সবাই শাহীনুর রহমানের বন্ধু-সমবয়সী। একমাত্র মোহাম্মদ বারী হলেন তাদের সবার বড়ভাই-বন্ধু। সাক্ষাৎকারটি অনুলিখন করেছে—'অনুস্বর' নাটকের দলের সদস্য শাকিল মাহমুদ।]

**শাহীনুর রহমান তোমার আসন্ন পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাই। শুরুতেই আর সবার মতো জানতে চাই তোমার ছোটবেলার কথা...**

আমার জন্ম নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে। কিন্তু আমার কাছে ওই জন্মভিটের তেমন কোনো স্মৃতি নেই বললেই চলে। বাবার চাকুরিসূত্রে আমরা খুলনায় চলে যাই। তারপর খুলনাতেই আমরা স্থায়ী হয়ে যাই। তখন আমার বয়স চার। এরপর মাঝেমধ্যে বেড়াতে যাওয়া হয়েছে বেগমগঞ্জে। তাই শৈশব বলতে আমার কাছে খুলনার স্মৃতিটাই বেশি। খুলনার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা। ওখানকার কলোনিয়াল লাইফ... মানে আমরা যে কলোনিতে থাকতাম তার নাম ছিল 'ফোরম্যান কলোনি'। কলোনিতে আমাদের বাসা, বাসার বারান্দা-লাগোয়া ছিল আমার ঘর। সেই ঘরকে ঘিরে আমার স্মৃতি। আমি ছবি এঁকে এঁকে ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে রাখতাম।

**আমাদের আসলে জানার ইচ্ছা যে, ছোটবেলায় কীভাবে তুমি প্রথম ভেবেছিলে যে একদিন শিল্পী হবে কিংবা ছবি আঁকবে... মানে এই ছবি আঁকার নেশাটা কীভাবে এলো?**

আসলে এটাকে আমার নেশা মনে হয়নি। আমি বোধহয় জন্ম থেকেই এই গুণটা পেয়েছি। যেমন, আমি যখন ছোট... তখন থেকেই নাকি চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে কী যেন আঁকতাম।... এমনটাই মা-বাবাসহ পরিবারের সবার কাছে শুনেছি...

**পরবর্তী সময়ে চারুকলায় পড়া বা চিত্রশিল্পী হওয়া... আমরা তো জানি তোমার মা-বাবা অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। এ নিয়ে পরিবার থেকে বাধা আসেনি?**

আমার মা-বাবা দুজনেই নামাজ-রোজা করতেন। কিন্তু তারা এখনকার অনেক

নামাজি-ধার্মিকের চাইতে অপেক্ষাকৃত লিবারেল ছিলেন। তবে আমি যখন চারুকলায় ভর্তি হবো, তখন বাবা শুধু বলেছিলেন–তুই চারুকলায় পড়লে পাগল হয়ে যাবি। চারুকলায় যারা পড়ে তারা চুল বড় রাখে... মানে উনি চারুকলায় পড়া কয়েকজনকে দেখেছেন... চুল বড়, পাগলের মতো... হা হা হা। কিন্তু চারুকলায় পড়লে ঈমান-আমান নষ্ট হবে এমনটা কখনো বলেননি বা এমন বিষয় নিয়ে কখনও তর্ক করেননি। শুধু তাই নয়, পরে যখন আমার বোন নাট্যকলায় পড়তে এলো তখনো আব্বা-আম্মা এটা সহজেই মেনে নিলেন।

**খুলনাতে বেড়ে ওঠাটাকে কেমন মনে হচ্ছে? কোনো নাগরিক ছোঁয়া আঁচ করা গেছে ছোটবেলায়?**

খুলনা নগরীতে থাকলেও আমরা ছিলাম মূল শহর থেকে একটু দূরে। তবে আমাদের কলোনিতে নাগরিক সুবিধার সবকিছু ছিল–খেলার মাঠ, ক্লাব, মসজিদ। বাসার একটা বাল্ব নষ্ট হয়ে গেলে সেটা জানালেই বাল্ব সাপ্লাই করা হতো, অর্থাৎ যে অর্থে নাগরিক বোঝায় খুলনায় তা পাইনি হয়তো কিন্তু নাগরিক সুবিধার কমতিও ছিল না। বরং কলোনিতে আমার বিকাশটা হয়েছিল মাল্টি-ডাইমেনশনাল। বিভিন্ন পেশার মানুষ... একসাথে দেখা হচ্ছে... আড্ডা হচ্ছে, খোঁজখবর নিচ্ছে... এমন আরকি...

**তাহলে গ্রামটাই আর রইল না তোমার? চিত্রকর্মে বা নাটকে সেট নির্মাণ করতে গেলে... একেবারে গ্রামীণ চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে কেমন অনুভব হয়?**

গ্রামীণ পটভূমির কোনো কাজ আমি তেমন করিনি। সেই যে চার বছর বয়সে বেগমগঞ্জ থেকে চলে আসা, তখনই গ্রামটাকে ফেলে আসা হয়েছে। আমার ধারণা বুক কভার, নাটকের সেট ইত্যাদি কাজে গ্রামীণ বিষয়টা তুলে ধরতে পারি না আমি, বিশেষ করে শিশুতোষ কোনো কাজ করতে গেলে গ্রামীণ অনুষঙ্গের যে অনিবার্যতা দেখা দেয় এটা আমাকে বিড়ম্বনায় ফেলে। মূলত এ বিষয়টা আমার লব্ধ নয়। আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি তা পুরোপুরি নাগরিক না হলেও গ্রামীণ নয়। নগরসংস্কৃতি, নগরডেভেলপমেন্ট, নগরবিচ্ছিন্নতা এ বিষয়গুলো আমি ভালো দেখতে পারি বা তুলে ধরতে পারি। আসলে আমি নগরের মধ্যেই থেকেছি। সেই অর্থে আমার গ্রামীণ কোনো স্মৃতি নেই... যার ফলে কাজের ক্ষেত্রেও সেটা সমস্যা তৈরি করে... সমস্যা মানে... আমি ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না বা আসলটা দিতে পারি না। এটা আমার সীমাবদ্ধতাও বলতে পারেন।

**তুমি শিশু অবস্থায় শুয়ে শুয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে কিছু একটা আঁকতে, সেই থেকেই পরবর্তী সময়ে চারুকলার প্রতি আকৃষ্ট হলে... এমনটাই বলতে চাচ্ছ?**

না, একেবারেই তেমন না। আমি যখন মেট্রিক পরীক্ষা শেষ করলাম... তখন খুলনায় একটা আর্ট কলেজ ছিল... সেখানে গিয়ে অন্যদের আঁকা দেখতাম। আমিও বসে যেতাম কখনও-সখনও। তখন চারুকলার শিক্ষা নিয়ে একটু ধারণা তৈরি হচ্ছিল। এর আগে এমন



হয়েছে আমি হয়তো জলরঙে একটা ছবি আঁকলাম, শিল্পীদের মতো ছবিটার একটা নামও দিলাম কিন্তু জলরঙে আঁকা ছবির মাধ্যম লিখতে গিয়ে লিখলাম তেলরং। বোধ হয় মেট্রিকের আগেও আমি কোনোভাবে কিছু প্রদর্শনীর ক্যাটালগ পেয়ে গিয়েছিলাম। যখন ইন্টার পরীক্ষা দিলাম, তখন থেকেই একটা ধারণা হলো। তারপর পাশ করার পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম।

**খুলনা থেকে সোজা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়– ঢাকায়ও তো পড়তে পারতে?**

তখন আসলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও চারুকলায় অনার্স চালু হয়নি। যদি ঢাকায় ভর্তি হতাম, আমাকে দুবছরের পড়াশোনা ভুলে প্রি-ডিগ্রিতে ভর্তি হতে হতো। তাই চট্টগ্রামে যাওয়া।

**ছবি আঁকা বা চারুকলার পড়ার বিষয়ে বন্ধুদের বা... মানে আশেপাশের কাছের মানুষদের রিঅ্যাকশন কেমন ছিল?... মানে বলতে চাচ্ছি কাছের মানুষরা এটাকে কীভাবে নিলো?**

আমি যখন 'খুলনা আর্ট কলেজে' যেতাম তখন মেহেদী নামে একজনের বাসায় যেতাম খুব। কারণটা হলো সেখানে আর্টের অনেক মেটেরিয়ালস, বিশেষ করে ক্যাটালগ দেখতে পেতাম। আর আমার ভিতরে উদ্দীপনাটা ছিল বলে বন্ধুরা বা আশেপাশের মানুষেরা নেগেটিভ রিঅ্যাকশন কখনও করতে পারেনি।

**বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটা নিয়ে কিছু বলো...**

সে এক বর্ণাঢ্য জীবন! কোনো পার্শ্বচিন্তা নেই। আমরা যখন শহর থেকে ক্যাম্পাসে যেতাম... ট্রেনে... তখন জার্নিটা ছিল আর্টিস্টিক। প্রায় ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার জার্নি। ট্রেনে চড়তে চড়তে ল্যান্ডস্কেপ দেখতাম। অক্সিজেন মোড়ে এলে মোড়টাকে অজন্তা ইলোরা গুহার মতো মনে হতো আমার। ট্রেনে খুব ঠাসাঠাসি হতো। আমি সব সময় দরজায় বসতাম হ্যান্ডেল ধরে। আমাদের ওই ট্রেনটা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শ্লথগতির একটা ট্রেন। সে বিষয়গুলো নস্টালজিক।

**লিটলম্যাগের সাথে যুক্ত ছিলে একসময়... কখন থেকে...**

মূলত লিটলম্যাগের সাথে যুক্ত হই ভার্সিটিতে দ্বিতীয় বর্ষে থাকতে। 'দ্রষ্টব্য' দিয়ে শুরু। দ্রষ্টব্য দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানের লিটলম্যাগের লোকেরা... তার আগে একটু বলি... প্রথমে আমি হলে উঠেছিলাম...ক্যাম্পাসের তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা, মানে 'শিবিরের' কার্যক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে ফাতহাবাদে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করি। সেখানেও একই পরিস্থিতি। শেষে একেবারে শহরে চলে আসা। আর শহরে এসে যা হয়েছে...তাহলো...বিভিন্ন মানুষের সাথে আড্ডা শুরু হয়ে গেল। ফলে মাল্টি ডাইমেনশনাল একটা বিকাশ ঘটেছে আমার মধ্যে...

**তাহলে লিটলম্যাগের ব্যাপারটা...**

লিটলম্যগের প্রতিষ্ঠানবিরোধী চরিত্রের জন্য আমি লিটলম্যাগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হই। এ সময়ে অনেকের সাথে ভালো বন্ধুত্ব হয় আমার। আমিও প্রতিষ্ঠানবিরোধী একটা চেতনা লালন করতে থাকি। আমাদের একটা ম্যানুফেস্টো ছিল...সেটা হলো দৈনিক পত্রিকার বাণিজ্যিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। লিটলম্যাগাজিন চর্চাটা মূলত আমার কাছে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার বিষয় থেকে। যেকোনো পত্রিকাতেই আমি কাভার করতাম না...প্রচ্ছদ করতাম না...টেক্সট-বিষয় কিছু পছন্দ না হলে...আর যে মানুষগুলো লিখেছে, তাদের মেজাজ-জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, সব দেখেই আমি কাজ করতাম। যে পত্রিকাগুলোয় আমি কাজ করেছি তারা যেহেতু প্রতিষ্ঠানবিরোধী...তাই কাজ করতে পেরেছি স্বাচ্ছন্দ্যেই। অনেকেই চিঠি লিখতো কাভার-প্রচ্ছদের জন্য, পেইন্টিং-এর জন্য। সেগুলো করে পোস্ট করে দিতাম...সিলেটে, বরিশালে, রংপুরে...এরকম বিভিন্ন জায়গায় লিটলম্যাগ বের হতো। প্রায় ত্রিশটার মতো লিটলম্যাগের কাভার করেছি আমি।

**আঁকাআঁকি ছাড়া লিটলম্যাগে কখনো লেখালেখি হয়েছে?**

একটা-দুটো আর্টিক্যাল লেখা হয়েছে। যা বলার মতো না।

**তোমার আঁকা ছবি নিয়ে প্রদর্শনী হয়েছিল কখনো?**

২৫টি ছবি নিয়ে একবার প্রদর্শনী হয়েছিল, সে ছাত্রাবস্থায়, চট্টগ্রামে। প্রদর্শনীর নাম



দিয়েছিলাম 'যাপনযজ্ঞে স্বকৃত উত্থান'। প্রদর্শনীর একটি ছবিও বিক্রি হয়নি। কেননা সেই সব ছবি ড্রয়িংরুমে দেয়ালে লাগানোর মতো ছিল না। ফলে ২৫টি ছবিই একে-ওকে দিয়ে দিই আমি। ছবিগুলো বিক্রি না হওয়ার কারণ হলো...ছবিগুলোতে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা ব্যাপকভাবে ফুটে উঠেছিল।

**কিন্তু শিল্পীমহলে সেই থেকে 'ঘোড়া শাহীন' বলে তুমি পরিচিতি পেলে... কী কারণে এ পরিচয়?**

আরে না, এ হলো ক্যাম্পাসে আরও এক শাহীন ছিল...

**না মানে আমরাতো জানি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিকে 'মুরগি অমুক', 'বিলাই অমুক' 'গলাকাটা... গালকাটা অমুক' বলে পরিচিতি দেয়া হয়... হা হা হা... 'ঘোড়া শাহীন' তেমন কিছু নয়তো?... হা হা হা...**

হা হা হা...না...অবশ্যই না...কারণ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তো দূরের কথা, আমি একটা পিঁপড়ার মৃত্যুও সহ্য করতে পারি না, মেনে নিতে পারি না।...আসলে হয়েছে কী...আমি তখন ব্যাপক 'ঘোড়া'র ছবি আঁকতাম। অভ্যন্তরে উর্ধ্বলোকে যাত্রা...এটি একটি সিরিজ আমার, এটা আঁকতে যেয়ে ঘোড়া আর নিজের চরিত্রকে মিলিয়ে ফেলি। ঘোড়ার যে শক্তি, সে শক্তি নিজের ভেতর অনুভব করতে চেয়েছি।...তো...প্রচুর ছবি এঁকেছি ওই সময়ে ঘোড়া নিয়ে...ধারণ করার চেষ্টা করতাম নিজেকে ঘোড়ার শক্তিতে...যার ফলে বন্ধুরা 'ঘোড়া শাহীন' নাম দিয়ে দেয়...হা হা হা...ডিপার্টমেন্টে আরেক শাহীন ছিল, শহরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলেও আরেক শাহীন ছিল যে ইংরেজিতে পড়ত...

**আমরা লক্ষ করছি প্রায় ১৪ বছর ধরে তেমনভাবে ছবি আঁকছ না তুমি। ১৪ বছর ধরে ছবি আঁকা থেকে দূরে থাকা, এটা কেন?**

আঁকিনি বিষয়টা এমন নয়। প্র্যাকটিসের জন্য এঁকেছি। কিন্তু কোনো পেইন্টিং করিনি। এর কারণ হলো...বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষে জীবিকার জন্য ঢাকায় চলে আসি। তারপর একটা ব্যবসা শুরু করা...নানান ডিজাইন করা...তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল...বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে আমার রেজাল্ট খুবই ভালো ছিল। বাংলাদেশ চারুকলায় অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া প্রথম ছাত্রদের একজন ছিলাম আমি। কিন্তু মাস্টার্সে গিয়ে শিক্ষকপলিটিক্স এবং আমাকে অপছন্দ করা কিছু শিক্ষকের কারণে মাস্টার্সে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হই। এর ফলে অদ্যাবধি সার্টিফিকেট তুলতেও ক্যাম্পাসে যাইনি।...মূলত আমার ইচ্ছা ছিল চারুকলার শিক্ষক হওয়া...এর মধ্য দিয়ে হয়তো চিত্রকলার সাথে পরিপূর্ণভাবে...সার্বক্ষণিকভাবে থাকার একটা সুযোগ হতো। মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষকতা করা হলো না। এসব কারণেই আঁকাঝোঁকা থেকে...পেইন্টিং থেকে...এক প্রকার দূরে থাকা হয়েছে।

**যতটুকু শুনেছি লিটলম্যাগের কাভার, নাটকের সেট-পোস্টার, বইয়ের প্রচ্ছদের কাজ করার জন্য তুমি কোনো অর্থ নাও না... এর কারণ কী?**

এটা একটা 'কন্ট্রিবিউশন'। আবার আমি যার-তার কাভার, সেট-পোস্টার বা প্রচ্ছদও করছি না। আমার ভাবনা আদর্শের সাথে যায় এমন কাজগুলোই করি...এবং সেটা আমার কন্ট্রিবিউশন। এসবক্ষেত্রে আমার ব্যবসা করার কোনো চিন্তা কখনোই ছিল না। আর অর্থ বা টাকা নেয়া না নেয়া বিষয়টা মূল না। আমি যে আর্টওয়ার্ক করছি তার বিশেষত্বই আমাকে চিনিয়ে দিবে 'আমি কে?'... আর এটাই আমার কন্ট্রিবিউশন।

**তোমার সাথে অতিসংক্ষিপ্ত আলাপ করার সুযোগ হলো। আশা করি ভবিষ্যতে বৃহৎকলেবরে আলাপ করবো। আপাতত এখানেই শেষ করি। আবারো তোমাকে পঞ্চাশ বসন্তের শুভেচ্ছা জানাই।**

আমাকে নিয়ে এত বড় বড় মানুষেরা, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা একটা আয়োজন করছেন... তাতে আমি একদিকে বিচলিত-লজ্জিত... আবার অন্যদিকে মনে হচ্ছে আমার এত এত বন্ধু আছে তা আমার জানা ছিল না... আমি আপনাদের বন্ধু হতে পেরে অন্যরকম একটা অনুভূতি টের পাচ্ছি।



# শাহীনুর রহমানের ড্রইং